দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২৩ তম সংখ্যা ❖ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬ বাইরে কোচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন ২
- বাজেটে সমাজের দুর্বল শ্রেনী অবহেলিত আয়কর ছাড় বাড়িয়ে ধনীদের প্রতি চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব ৪
- পাড়াগাঁয়ের ভবিষ্যৎ ৬
- কেন্দ্রের বাজেট ব্রাত্য পরিবেশ, ব্রাত্য শ্রমজীবী ৯
- বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়ি ধ্বংস করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৯
- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে যা কিছু প্রথম ১১
- বাংলাদেশ বেঁচে থাকার শ্লোগান-'জয় বাংলা' ১২
- কুম্ভযাত্রা হিন্দুরাষ্ট্রের অভিসন্ধিতে ভরাপথ ১৪
- কেজরিওয়ালের দিল্লি-পরাজয় প্রায় অনিবার্যই ছিল ১৬
- ঢাকি সমেত বিসর্জন-- বিপজ্জনক ভাবনা ১৮
- পুরনো লেখা ফিরে দেখা বাংলা উপন্যাসের ধারায় গৌরকিশোর ঘোষ ১৯
- নাগরিক স্মৃতিচারণা মৌলবি মুজিবর রহমান এক বিস্মৃত সাংবাদিক ২০
- মিথ্যা অভিযোগে ধৃত উমর খালিদের মুক্তির আহ্বান জানালেন ১৬০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ২৩
- গুজরাট দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ জাকিয়া জাফরি প্রয়াত ২৪
- বর্তমান বৈশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প এবং মোদীর বৈঠক ২৬
- মণিপুর খালি হাতে ফিরলেন পাত্র। এখন ও সম্বিত ফেরেনি বিজেপির ২৭

➲সম্পাদকীয়

মোদীর মতে আদানীর দুর্নীতি ব্যক্তিগত বিষয়

ট্রাম্প নির্বাচনে জেতার পর মোদীর সঙ্গে তাঁর প্রথম বৈঠকটি শেষ হয়েছে। এই বৈঠকের মাত্র এক সপ্তাহ আগে একটি আমেরিকান সামরিক বিমান অমৃতসরে অবতরণ করেছিল যাতে হাতে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় ১০৪ জন ভারতীয় নাগরিককে ডিপোর্ট করা হয়েছিল। এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতি নরেন্দ্র মোদী ভয়ে প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। মোদী বলেছেন অবৈধ বাসের অধিকার কারো নেই। মোদির ভারতীয় নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ ডিপোর্টেশনের আহ্বান জানানোর সাহস ছিল না। মোদী দেশের মাটিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন না। উনি গত ১১ বছরে দুটি মাত্র সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তাও বিদেশের মাটিতে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে ছিল তাঁর তৃতীয় সাংবাদিক সম্মেলন। এক সাংবাদিক মোদীকে প্রশ্ন করেন তাঁর সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকে আদানির বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা। আদানি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর খুবই ঘনিষ্ঠ সহযোগী সে কথাও উল্লেখ করেন ওই সাংবাদিক। জবাবে মোদী বলেন ' ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ তাঁর কাছে গোটা বিশ্ব একটি পরিবার যা বসুধৈব কুটুম্বকম নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত ভারতীয় এই পরিবারের অংশ।' ওই সাংবাদিকদের প্রশ্নের সঙ্গে বসুধৈব কুটুম্বকম নীতির কি সম্পর্ক বোঝা গেলনা। এই প্রশ্নে বিব্রত ও বিরক্ত মোদী বলেন 'যখন দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বৈঠকে বসেন তখন এই সব ব্যক্তিগত বিষয় আমরা আলোচনায় আনিনা।' সকলেই জানে কিভাবে মোদি আদানিকে একের পর এক দেশে লাভজনক চুক্তি পেতে সাহায্য করেছেন। শুধুমাত্র মোদিই ব্যাখ্যা করতে পারেন কিভাবে একজন নিন্দিত দুর্নীতিবাজ ভারতীয় পুঁজিপতির প্রশ্ন, যার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, একটি 'ব্যক্তিগত বিষয়' হয়ে ওঠে! এবং এটি কার জন্য একটি 'ব্যক্তিগত বিষয়' - আদানি বা মোদি?

লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন 'আমেরিকায় মোদীজি আদানিজির দুর্নীতি ধামাচাপা দিয়েছেন। বন্ধুদের পকেট ভরাট করাই যখন মোদীজির কাছে রাষ্ট্রনির্মাণ, তখন ঘুষের কারবার ও দেশের সম্পত্তি লুঠ করা ব্যক্তিগত বিষয়ই হয়ে যায়। কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেছেন 'আদানির নাম শুনে মোদীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। পরে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে জানালেন, এটা ব্যক্তিগত বিষয়। দুর্নীতি কবে থেকে ব্যক্তিগত বিষয় হল ?'

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

বাজেট ২০২৫-২৬
বাইরে কোচার পত্তন
ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন

অমিত দাশগুপ্ত

বাজেট পেশ করার পরে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। মধ্যবিত্তের জন্য আয়করের সুরাহা ফল দিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে। বাজেট কিংবা পুলিশি ব্যবস্থা, মন্দির তৈরি কিংবা প্রয়াগে সঙ্গমে ডুব, সব কিছুর উদ্দেশ্য তো একটিই, নির্বাচনী মোক্ষলাভ। সেই জন্যই দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগেই করে সুরাহা। যে দেশের শাসক নির্বাচনে জেতার জন্যই সমস্ত চিন্তাকে সংহত করে, এবং শেয়ার বাজারের দিকে চোখ রেখে অর্থনীতিকে পরিচালিত করে, তারা যদি কোন 'জনমুখী' সিদ্ধান্তও নেয় তা সামগ্রিকে স্বল্পকালীন ভাবনা, আদতে নির্বাচনে জেতার তাগিদে জনমোহিনী প্রয়োগ, যা অবশ্যই সেই শাসকের নিজ শ্রেণির প্রতি আনুগত্যকে একটুও খর্ব না করেই তৈরি করা হয়। এই বাজেটের করের সুরাহাও তেমনি এক প্রকরণ, যার দ্বারা একদিকে মধ্যবিত্তের ভোগচাহিদা সৃষ্টি করে কর্পোরেট দুনিয়ার মুনাফা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করা হল, অপরদিকে কেবল নতুন কর জমানার জন্য করের সুরাহা দ্বারা বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, আবাসন ঋণে সুদ, ৮০সি ধারায় সঞ্চয় এরূপ সমস্ত বিষয়কে নিরুৎসাহিত করে শেয়ার বাজারে মধ্যবিত্তের সঞ্চয়কে আকৃষ্ট করা হল।

যেহেতু আয়করের ছাড় বা সুরাহার উপরেই এই বাজেটের আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করতে চাইছে শাসকেরা তাই সেই বিষয়ে প্রথমে দৃষ্টি দেওয়া যাক। শাসক ও তাদের তাঁবেদার প্রচার মাধ্যম, বিজেপি যখন যেমন বলে তেমনি প্রচার করে। দিল্লি বা পশ্চিমবঙ্গে অন্যতর শাসক দল যদি জনমোহিনী কোনো প্রকল্প গ্রহণ করে, যদি সাধারণ মানুষের হাতে ভরতুকি বা টাকা তুলে দেয় তাহলে তাকে খারাপ বলে মোদিজি রেউরি সংস্কৃতি বলে ব্যঙ্গ করবেন, প্রচার মাধ্যম তাকে তেমনি ভাবেই তুলে ধরবে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশে বা মহারাষ্ট্রে ভোট কেনবার জন্য লাডলি বহেন বা অনুরূপ কোনো টাকা দেওয়ার প্রকল্পকে মাস্টার স্ট্রোক বলে প্রশংসা করা হবে, মোদিজিও যথাবিহিত দ্বিচারিতায় সেগুলির গুণ গেয়ে টেলিপ্রম্পটার দেখে বক্তৃতা দেবেন। আয়করের ছাড়ও তেমনি ব্যাপার। গত বাজেটেও উনি তেমন কর ছাড় দেননি, তখন কি উনি মধ্যবিত্ত বান্ধব ছিলেন ছিলেন না? এবার একলাফে ৭ লাখ অবধি নিস্কর আয়ের বন্দোবস্ত থেকে তা বাড়িয়ে ১২ লাখ করে দিলেন, অর্থাৎ বৃদ্ধির হিসেবে ৭১ শতাংশের বেশি। করেই বলতে শুরু করলেন, নেহরু ইন্দিরা রাজীব সকলকে মাত করে দিয়েছি। কোনো প্রচার মাধ্যম প্রশ্ন করল না, তুলনাটা গত ইউপিএ সরকারের সঙ্গে করা দরকার, ৬১ বছর আগে গত হওয়া বা ৪১ কিংবা ৩৪ বছর আগে খুন হওয়া ব্যক্তিদের আমলের সঙ্গে নয়। তাছাড়া হিসেবের তুলনা করার জন্য সমস্তরের, সমবিন্যাসের বিষয়ের মধ্যে তুলনা করা দরকার। ওই ৭ লাখ বনাম ১২ লাখ তো মোদিজির আমলে সৃষ্ট নতুন কর কাঠামো, যা ২০১৪ সালে ক্ষমতা থেকে নির্বাসিত হওয়া মনমোহন সিংএর ইউপিএ সরকারের আমলে ছিলই না। যদি তুলনা করতে হয় তাহলে তা করা উচিত পুরোনো কর কাঠামোর প্রেক্ষিতে, যেটা এখনো বর্তমান। ২০১৪ সালে যে আয় পর্যন্ত কর দিতে হত না তা ছিল ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। সেই পুরোনো কাঠামো এখনো বজায় রয়েছে। সেখানে ওই করমুক্ত আয়ের সীমা এখন ৫ লক্ষ টাকা। গত ১১ বছরে বাজার দর বৃদ্ধির নিরিখে ২০১৪ সালের ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বর্তমানের ৫ লক্ষ টাকার কম হবে বলে মনে হয় কি?

নতুন কর কাঠামোয় মধ্যবিত্তের উপরে করের বোঝা কমেছে। সাধারণ মধ্যবিত্তের উপরে করের বোঝা কমানোকে সমর্থন না করে তার নিন্দে করা কখনোই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু এই সরকারগুলি এমনই যে মধ্যবিত্তের উপরে কর কমানোর পিছনেও অন্য উদ্দেশ্য থাকে। গত বাজেট পর্যন্ত নতুন করা কাঠামোর করের বোঝা ও পুরোনো কর কাঠামোয় বিভিন্ন ছাড়ের সুবিধার ফলে করের বোঝার পরিমাণ তুল্যমূল্য ছিল, অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো কাঠামো আকর্ষণীয় ছিল। এই বাজেটে পুরোনো কাঠামোকে (আয়ের উর্দ্ধসীমা ও করের হার) একই রেখে দেওয়া এবং নতুন কাঠামোয় করের উর্দ্ধসীমা ও হারকে কমানোর ফলে নতুন কাঠামো বেশিরভাগ করদাতার কাছেই সুবিধেজনক হবে। নতুন কাঠামোয় ৮০ সি ধারার অধীনে সঞ্চয়, নতুন পেনশন প্রকল্পে জমা, ৮০ ডি ধারার স্বাস্থ্যবীমার প্রিমিয়াম, গৃহঋণের সুদে বা মূলধন শোধ, ব্যাঙ্ক আমানতের সুদ ইত্যাদিতে কোনো ছাড় পাওয়া যাবে না।

ফলে মধ্যবিত্ত হয়তো বেশি ব্যয় করবে। কিন্তু এর সঙ্গে ছাপোষা মধ্যবিত্ত যেখানে নিরাপদ সঞ্চয় করত সেই অর্থ তাঁরা শেয়ার বাজারে খাটাবে, ঝুঁকি থাকা সত্বেও, তার লোভ তো নিত্যই দেখানো হচ্ছে। কেবল তাই নয়, কারো আয় ১২ লক্ষ (বেতনভোগীদের ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার) টাকার থেকে ১ টাকা বেশি হলেই তাঁর করের পরিমাণ হবে ৬২,৪০০ টাকা। ফলে যে সমস্ত বয়স্ক মানুষ সুদের টাকা আয় করেন, ব্যাঙ্কে নিরাপদ আমানত রেখে, তাঁরা সুদের আয় কমিয়ে ওই কর বাঁচাতে চাইবেন বলে নিরাপদ ব্যাঙ্ক আমানতের থেকে সেই অর্থও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করবেন। ফলে যে শেয়ার বাজারের দিকে মধ্যবিত্তকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা বরাবর এই বেনিয়া সরকার চালিয়ে যাচ্ছে তাকে উৎসাহ দেওয়ার কাজটিও করা হয়েছে এই ধরণের কর বিন্যাসের ফলে। তাই করের সুরাহার বিষয়টিকে মোদি সরকারের কেবল সদিচ্ছা বলে ভাবার তেমন কারণ দেখা যাচ্ছে না।

বাজেটে ব্যক্তিগত আয়কর এক এবং একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। মোট কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করবে ৫২.৫৮ লক্ষ কোটি টাকা। যার মধ্যে আয়করের পরিমাণ ২৪.৪২ লক্ষ কোটি টাকা; অর্থাৎ, ৪৬. ৪ শতাংশ। ওই আয়করের

মধ্যে কর্পোরেটদের কাছ থেকে কর আদায় হবে ১০.৮২ লক্ষ কোটি টাকা (৪৪.৩ শতাংশ) ও ব্যক্তিগত আয়কর আদায় হবে ১৩.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা (৫৫.৬ শতাংশ)। ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের সংশোধিত হিসেবে তা ছিল যথাক্রমে ৪৫.১ শতাংশ ও ৫৪.৯ শতাংশ। অবশ্য ২০২৪-২৫এর বাজেটে অনুমান ছিল যথাক্রমে ৪৭ শতাংশ ও ৫৩ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালের আদায় ছিল যথাক্রমে ৪৭.৪ শতাংশ ও ৫২.৬ শতাংশ।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আয়করের মধ্যে কর্পোরেটদের কর কমছে ও ব্যক্তিগত আয়করের অংশ বাড়ছে। এমনকি, বর্তমান বাজেটে ব্যক্তিগত আয়করে সুরাহা দেওয়ার পরেও তার অংশ বাড়বে বলেই ধরা হয়েছে। এদেশে কর্পোরেটদের মুনাফার উপরে আয়কর যে কম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সরকার সেই আয়ের উপরে করের হার বাড়াতে নারাজ। কারণ, সরকারটা পুঁজিপতিদের উপরে নির্ভরশীল; শাসক দলটাও পুঁজিপতিদের চাঁদার কাছে নতজানু। কর্পোরেট পুঁজি ও শাসকের মধ্যে বিনিময়ের সম্পর্ক বর্তমান।

বাজেটের সময়ে সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের হিসেব করে তার জন্য আয়ের বন্দোবস্ত করাই দস্তুর। অবশ্য সেই ব্যয়ের বাজেট করার সময়ে দেশের আর্থিক অবস্থার সাপেক্ষে প্রয়োজনীয়তাকে বিচার করা হয়। সাধারণভাবে সরকার চালানোর প্রশাসনিক ব্যয় ব্যতিরেকে সমাজকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে ব্যয় সরকারি বাজেট গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। একদিকে শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূলধনী ব্যয় ও সেসব ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজ চালানোর ব্যয়, অপরদিকে সরকারি মালিকানায় থাকা বাণিজ্যিক ভাবে পরিচালিত সংস্থাগুলির জন্য মূলধনী ব্যয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। ভারত সরকার বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে হাত প্রায় গুটিয়েই নিয়েছে। বাণিজ্যিক সংস্থায় বিনিয়োগ নেই বললেই চলে। রেলওয়ের বিবিধ কাজ বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া সত্বেও রেল দফতরের জন্য একটি বড় বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। রেলওয়ের জন্য আলাদা বাজেট তুলে দিয়ে এই সরকার সাধারণ বাজেটেই তা করতে শুরু করেছে।

যদি সামাজিক ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ সালের বাজেট বরাদ্দ ও সংশোধিত অনুমানকে দেখা যায় তাহলেই বোঝা যাবে যে, সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে ব্যয় কীভাবে কমানো হয়েছে। ২৩-২৪ সালে সামাজিক সেবার রাজস্ব খাতে ব্যয় ছিল ২.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা, ২৪-২৫ সালের বাজেট বরাদ্দ ছিল ২.৪১ কোটি টাকা, সংশোধিত বরাদ্দে তা কমে হয়েছে ১.৮৯ কোটি টাকা। ২৫-২৬ এর বাজেটে গতবারের বরাদ্দের থেকে ১৭ শতাংশ কমিয়ে তা ১.৯৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। ফলে সামগ্রিক রাজস্ব খাতে খরচের মাত্র ৫.৫ শতাংশ সামাজিক সেবা খাতে খরচ করার কথা ভাবা হয়েছে। গত ২০২৪ সালের বাজেটেও সেই বরাদ্দ ছিল ৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালে প্রকৃত বরাদ্দ হয়েছিল ৭.৬ শতাংশ। ফলে বাজেটে সামাজিক সেবার ব্যয় ক্রমাগত কমছে এটা দেখাই যাচ্ছে।

আরেকটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। ২০২৩-২৪ সালে সাধারণ শিক্ষায় মোট রাজস্ব খাতে খরচের মাত্র ১.৭ শতাংশ খরচ করা হয়েছিল। ২৪-২৫ সালের বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল ১.২ শতাংশ। এই বাজেটে তার অংশ কমে হয়েছে ১.১ শতাংশ।

কৃষির উপরে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বাজেট বক্তৃতায়। সেই খাতটিও দেখা যাক। ২০২৩-২৪ সালে মোট রাজস্ব খাতে খরচের ১২.২ শতাংশ খরচ করা হয়েছিল। ২৪-২৫ সালের বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল ১০.৮ শতাংশ। এই বাজেটে তার অংশ কমে হয়েছে ১০.৩ শতাংশ। গ্রামোন্নয়নে ২০২৩-২৪ সালে খরচ ছিল মোট রাজস্ব খাতে খরচের ২.৯ শতাংশ, ২৪-২৫ সালের বাজেট বরাদ্দ ছিল ২.৬ শতাংশ। এই বাজেটে কমিয়ে করা হয়েছে ২.৫ শতাংশ। গ্রামোন্নয়নের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল গ্রামীণ কর্মসংস্থান যা ১০০ দিনের কাজ দিয়ে করা হয়। সেই খাতে ২০২৩-২৪ সালে খরচ হয়েছিল ৮৯ হাজার কোটি টাকা, ২০২৪-২৫ সালে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৮৬ হাজার কোটি টাকা, ২০২৫-২৬ সালের বাজেটেও তা ৮৬ হাজার কোটি টাকাই রেখে দেওয়া হয়েছে। ২ বছর ধরে যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তাকে পাত্তাই দেওয়া হয়নি। সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের রাজস্ব বাজেটেও খরচ কমানো হচ্ছে। ২০২৩-২৪ সালে যেখানে খরচ হয়েছিল ১০,৩৭১ কোটি টাকা (.০৩ শতাংশ) তা এই বাজেটে কমে হয়েছে ৭,৯৮০ কোটি টাকা (.০২ শতাংশ)।

বাজেটের বিশদ বিশ্লেষণ এরকম বহু অনালোচিত বিষয় তুলে ধরবে যা সমাজের গরিষ্ঠাংশের প্রতিসরকারের তাচ্ছিল্য প্রকট করে তুলবে। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি বাজেট বক্তৃতায় দেওয়া হয় তা কবে কোথায় কার্যকরী হয় তা জানা যায় না। পরে তা মানুষ ভুলে যায় বা ভুলিয়ে দেওয়া হয়। যেমন গত বাজেটে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ৫টি কর্মসূচির কথা এই বাজেটে আর কেউ মনে রাখেনি। মনে করা যাক; প্রথম বার নিয়োজিত কর্মীদের ভবিষ্যনিধি খাতে তিন কিস্তিতে এক মাসের বেতন বা ১৫ হাজার টাকা (যেটা কম) জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। জানানো হয়েছিল ২০ লক্ষ নব্য নিয়োজিত উপকৃত হবে। এবারের বাজেটে জানানো হয়েছে খসড়া প্রস্তাব তৈরির কাজ চলছে।

দ্বিতীয়ত, আগের বাজেটে বলা হয়েছিল ম্যানুফাকচারিং ক্ষেত্রে প্রথম নিয়োজিত ৩০ লক্ষ কর্মীর প্রথম ৪ বছরের কাজের সময়ে নির্দিষ্ট হারে কর্মী ও নিয়োগকর্তার ভবিষ্যনিধিতে দেয় টাকা প্রদান করা হবে। এটির ক্ষেত্রেও খসড়া প্রস্তাব তৈরির কাজ চলছে।

তৃতীয়ত, নিয়োগকর্তা যে অতিরিক্ত নিয়োগ করবে তার জন্য ভবিষ্যনিধিতে নিয়োগকর্তার দেয় টাকার ৩০০০ টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হবে। তার দ্বারা ৫০ লক্ষ নিয়োগের সংস্থান হবে। এটিরও খসড়া নিয়ে কাজ চলছে।

চতুর্থত, ২০ লক্ষ যুবককে ১০০০ আইটিআইএ প্রশিক্ষিত করা হবে, তার জন্য আইটিআই গুলিকে উন্নত করা হবে। এখানেও ক্যাবিনেট নোট চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

পঞ্চমত, ৫ বছরে ১ কোটি যুবককে ৫০০টি বৃহৎ কোম্পানিতে শিক্ষানবিশির বন্দোবস্ত করা হবে। এক্ষেত্রে কাজ এগিয়েছে। ওয়েব পোর্টাল তৈরি হয়েছে। কোম্পানিরা ১.২৭ লক্ষ শিক্ষানবিশের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ৬.২১ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে ৫ বছরের মধ্যে ১ বছর চলে গেছে। একটিও শিক্ষানবিশ নেওয়া হয়নি। বছরে ১.২৭ লক্ষকরেও যদি বিজ্ঞপ্তি বেরোয় তাহলেও আগামী চার বছরে ৫ লক্ষ শিক্ষানবিশও নিয়োজিত হবে না। ফলে আড়ম্বর করে করা ওই ঘোষণার বিষয়ে পুনরায় বাজেটে বলা হয় না কেন?

এই বাজেটে কী নেই এবং কী আছে তা নিয়ে বহু কথা বলা যেতে পারে। এক কথায় বলা যায় মোদি সরকারের সকল কাজ ও বাজেটের মত এই বাজেটেও সাধারণের জন্য অন্তর্বস্তুতে কিছু নেই, শুধু বহিরঙ্গে চমক আছে। ❐

কেন্দ্রীয় বাজেটে সমাজের দুর্বল শ্রেনী অবহেলিত আয়কর ছাড় বাড়িয়ে ধনীদের প্রতি চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব

অমিতাভ সিংহ

গত কয়েক বছরের মত এবছরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন একটি চূড়ান্ত একঘেয়ে বাজেট বক্তৃতা শেষ করার ঠিক আগে একটা বিশেষ নির্বাচনী চমক দিলেন। তা হল আয়কর প্রদানের হার বেশ কিছুটা কমিয়ে এবং আয়কর আইনের ৮৭এ নম্বর ধারাটির মাধ্যমে বিশেষ ছাড়ের পরিমান বৃদ্ধি করে। উদ্দেশ্য আসন্ন দিল্লী বা বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করা। ইতিমধ্যে উচ্চ মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত দিল্লীতে এর প্রভাব পড়েছে ও বিজেপি লাভবান হয়েছে। কিন্তু বাজেটের অর্থ শুধু আয়করের হারে পরিবর্তন বা ছাড় দেওয়া নয়। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটা দিশা থাকে যা দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায় এবং দেশের জনগণের সার্বিক বিকাশসহ তাদের জীবনধারণ সহজ করে তোলে। আসুন একটু দেখে নেওয়া যাক বর্তমান বাজেট এই লক্ষ পূরণে কতটা সহায়ক হতে পারে আগের বছরগুলির তুলনায়।

দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে যে দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দিনে দিনে কমছে,গ্রাম ও শহরে ভোগব্যায় কমেছে ও বেকারত্বের হার বেড়েই চলেছে(গত ৪৮ বছরে সর্বোচ্চ)। জিডিপির প্রকৃত হার নিম্নমুখী। যে কোন ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করলেই বলবে ব্যবসার দূরবস্থার কথা। তাহলে কাদের ব্যবসা ভাল চলছে? অম্বানী আদানীর মত গুটিকয়েক বৃহৎ সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী ছাড়া? এমএসএমই বা স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলির কি হল? গত বছর ফলাও করে ৫০০ টি কোম্পানিতে যে বেকারদের জন্য শিক্ষানবীশি বা অ্যাপ্রেনটিশ নিয়োগের প্রকল্প পিএম ইন্টার্নশিপ প্রকল্পে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ডিসেম্বর মাসে তাদের নিয়োগ হয়ে যাওয়ার কথা, তার কি হল? বাজেটে তা ধোঁয়াশায় রেখে দেওয়া হল। আদৌ কি এর কোন কাজ এগিয়েছে তা জানার উপায় নেই। এই প্রকল্পের ফলে গতবছরে বক্তৃতায় বলা হয়েছিল যে ১.২৫ কোটি চাকরি তৈরী হবে, তা হল কিনা তাও জানতে পারা গেল না। নেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মত বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবিলা করা হবে সে বিষয়ে ন্যূনতম কথা।

মেক ইন ইন্ডিয়া,মেক ফর দি ওয়ার্ল্ড নতুন মোড়কে এল। স্কিল ইন্ডিয়া মিশন,প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা বা ন্যাশানাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কি তাহলে প্রত্যাশা পুরণে ব্যর্থ? আসলে এবারের বাজেট অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তায় ভরা।মনে হয় গত কয়েক বছর যে উৎসাহ নিয়ে অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছিলেন তার প্রভাবে যে দেশের অর্থনীতি দিনে দিনে আরও তলিয়ে যাচ্ছে তা বোধহয় এতদিনে তিনি বুঝতে পারছেন।বিশেষকরে তারই অর্থনীতিবিদ স্বামী পরকলা প্রভাকর যখন প্রায়শই দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা করেন।তাই হয়তো তিনি কিঞ্চিত হতাশায় ভুগছেন।

পরিকল্পনাবিহীন ও দায়সারাভাবে প্রস্তুত এবারের বাজেটে নতুন প্রকল্পগুলি কিভাবে সরকার বাস্তবায়িত করবে বা অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। দেখা গেছে বিভিন্ন প্রকল্পগুলিকে একত্রিত করে তাতে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ না করে ঋণের মাধ্যমে তা সামলাতে চাওয়া হয়েছে, তা কি দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সুলক্ষণ বলে ধরে নেব? আবার সরকারের যেসব জায়গায় বিনিয়োগ করা প্রয়োজন সেখানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে বেসরকারি অংশ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। আরেকটা উল্লেখযোগ্য দূর্বলতা হল মূলধনী খাতে ব্যয় হ্রাস। ২০২৫-২৫ অর্থবর্ষে প্রতিশ্রুতির তুলনায় যা কমেছে ৯২,৬৮২ কোটি টাকা। এই খাতে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন কারণ এর ফলে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়,দীর্ঘস্থায়ী সুফল পাওয়া যায় ও অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। যেখানে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে আসছে সেখানে সরকারি বরাদ্দ সরাসরি বিনিযোগ একটা কার্যকরী তত্ত্ব বলে স্বীকৃত। জিডিপির অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যায়ের পরিমাণও কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বাজেটের প্রতিশ্রুত অনুপাত ছিল ১৫.০৪%, সংশোধিত হয়ে তা দাঁড়াল মোটামুটি ১৪.৫%। এবারের বাজেটে তা হল ১৪.১৯%। কম চাহিদার ঘেরাটোপে বন্দী অর্থব্যবস্থা সেখানে এই বাজেট কোনও আশার আলো দেখাচ্ছে না।

এবার দেখে নেওয়া যাক কোন কোন ক্ষেত্রে কিরকম অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। কৃষি এবার ধনধান্য যোজনা আনা হয়েছে বিদ্যমান কয়েকটি প্রকল্পগুলি একত্রীকরণ করে কিন্তু কোন আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ উল্লেখ করা হয় নি। ফসল বীমা যোজনায় ৩০০০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।এর ফলে কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে ও তারা আর্থিক সঙ্কটে পড়বে। একইসঙ্গে কৃষিজ দ্রব্যের মুল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। আর্থিক সমীক্ষা বলছে কৃষিজ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ২০২৪-২৫ সালে আগের বছরের তুলনায় ৭.৫ শতাংশ থেকে ৮.৪ শতাংশ হয়েছে, প্রধানত সবজি ও ডালের মূল্যবৃদ্ধির জন্য।

পি এম পোষণ : মনে রাখতে হবে বিশ্বে ১২৭ টি দেশের মধ্যে ক্ষুধাসূচকে ভারতের স্থান ১০৫ তম। আফ্রিকার বহু দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিশু অপুষ্টি বেশী। ইউএন ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের সমীক্ষা অনুযায়ী ১৬% মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে। অথচ অপুষ্টি কমানোর কেন্দ্রীয় প্রকল্প পিএম পোষণ এর বরাদ্দ কার্যত কমেছে। ৮ কোটি শিশু ও ২ কোটি সন্তানসম্ভবা মহিলা এর সুবিধা পায়। তাদের জন্য বেড়েছে মাত্র ০.২%, শিশুপ্রতি পাঁচ পয়সা। মুল্যবৃদ্ধির হার ধরলে তা মোটেও বাড়ে নি। ২০১২-১৩ সালে তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার,সেই সময় শিশুদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বরাদ্দ ছিল মোট সরকারি ব্যয়ের ৪.৭৬ শতাংশ, বর্তমানে তা ২.২৯ শতাংশ। বোঝা যায় এই সরকার শিশুদের কোন চোখে দেখে।

কংগ্রেসের আমলে আনা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা , গরীব কল্যাণ যোজনার বরাদ্দ ১০,০০০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কৃষি ও কৃষক কল্যাণে গত বছরের তুলনায় ২.৫% বরাদ্দ কমানো হয়েছে। সার ও রসায়নে কমেছে ১৩%।এর ফলে উৎপাদিত ফসলের দাম বাড়বে। জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প(MGNREG) গত দশ বছরে সর্বনিম্ন বরাদ্দ,বাজেটের মাত্র ১.৭৮ শতাংশ। এই প্রকল্পই করোনা মহামারির সময় দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের সহায় ছিল।

গ্রাম সড়ক যোজনা : এই খাতে বরাদ্দ গত পাঁচ বছরে সর্বনিম্ন। মোট বাজেটের মাত্র ০.২৫%। ২০২৩ সালে তা ছিল ০.৪৫%। সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP) ঃপ্রতিবন্ধী ভাতা, বৃদ্ধভাতা,বিধবাভাতা ইত্যাদি সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের খাতে ২০১৯ থেকে ২০২১ অর্থবর্ষে ছিল ১.২১% থেকে ০.৩৬%। এবার তা আরো কমে হল ০.২%। প্রধানমন্ত্রী পুষ্টি শক্তি নির্মাণ প্রকল্প (মিড ডে মিল ইত্যাদি) : বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ০.২৬%। এক দশকে সর্বনিম্ন।

উৎপাদন সেক্টর : প্রায় সব শিল্পের উৎপাদনশীলতা কমেছে। বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা টার্ন ওভারের শিল্পকে মাঝারি শিল্প বলে চিহ্নিত করে তাদের ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনও ব্যয়বরাদ্দের উল্লেখ নেই। গত দশ বছরে স্টার্ট আপ সংস্থাগুলি মাত্র এক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে। শ্রমিকেরা তাদের শ্রম দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের কল্যাণের জন্য বিশেষ কোনও চিন্তা বাজেটে নেই। শুধু শ্রম পোর্টালে নিজেদের নাম নিবন্ধক করলে স্বাস্থ্যবীমা পাবে। কাজের পরিবেশ বা জীবনের উন্নয়নের জন্য কোন প্রকল্প নেই। এমনিতেই তিনটি শ্রম কোড নিয়ে এসে সরকার তাদের যথেষ্ট ঘেরাটোপে বাঁধতে চলেছে।

শিক্ষা : এইক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান ছাড়া আর কিছুই নেই। পুরোটাই বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য : এই খাতে বরাদ্দ বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতি ধরলে তা প্রায় গত আর্থিক বছরের সমান। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির সুপারিশ ছিল বাজেটের অন্তত ২.৫% এই খাতে বরাদ্দ করতে হবে।এবারের বরাদ্দ ২ এরও অনেক কম। আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি দেশের কতিপয় ব্যবসায়ীর পকেট ভরতে পারে কিন্তু সামাজিক ন্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কি? এর চেয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করলে দেশের মানুষ বেশী উপকৃত হত না কি? তাছাড়া জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বীমার আওতার বাইরে রয়েছেন বেশীরভাগ নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণ পরিবার।জনজাতি ও দলিতরাও বঞ্চিতদের তালিকায়। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির সুপারিশ ছিল মোট বাজেটের দুই তৃতিয়াংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যে বরাদ্দ করা।কিন্তু এখনও সেই বরাদ্দ এক তৃতিয়াংশের সামান্য বেশী।স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়ামে জিএসটি ১৮ থেকে ৫ শতাংশ করার দাবীও সরকার মানছে না। নাকের বদলে নরুনের মত কয়েকটি দামী ক্যানসারের ওষুধের ওপর শুল্ক ছাড়। কোনরকমে চালু প্রকল্পগুলি সচল রাখা।দেশের শোচনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোনও সমাধান নেই সরকারের কাছে।উপরন্তু বিসিজি টিকা উৎপাদনের বরাদ্দ ৩.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

রেল : গত বছর বরাদ্দ ছিল ২.৬০ লক্ষ কোটি টাকা।এবছর তা নেমে হয়েছে ২.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা।গতবছর ২৯ টি বড় মাপের রেল দুর্ঘটনা সত্ত্বেও বরাদ্দ বাড়েনি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না বললেই নয়।সরকার ন্যাশানাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন এর মাধ্যমে প্রায় দশ লক্ষ কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চলেছে।

এরপর আসা যাক অর্থমন্ত্রীর চমকের আইটেমটিতে।তা হল আয়করে ছাড়ের প্রসংগে। আয়কর আইনের দুটো রেজিমে আয়কর দাখিল করা যায়।একটি হল পুরাতন রেজিম যাতে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকসনসহ বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প,মেডিকেল ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম, গৃহঋণ, পেনসন ফান্ড ইত্যাদি প্রকল্পগুলিতে খরচ করলে ও আয়করদাতারা বিশেষ করে প্রবীন নাগরিকেরা (সিনিয়র সিটিজেন) ব্যাঙ্কের বা কোনও কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা বিনিয়োগ করলে তার ওপর প্রাপ্ত সুদের ওপর ছাড় পান। তাদের মোটামুটি ছাড় দেওয়ার পর পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের ওপর কোন কর দিতে হয় না।অন্যদিকে নতুন রেজিমে চাকুরিজীবীদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকসন বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছাড়া আর কোন ছাড় পাওয়া যেত না। এক্ষেত্রে সাত লক্ষ টাকার ওপর আয়কর আইনের ৮৭ এ ধারাবলে কোন কর দিতে হত না। কিন্তু আয় একটাকা বেশী হলে সাধারণ আয়কর হার প্রযোজ্য হত। যদিও মার্জিনাল রিলিফ বাবদ কিছু ছাড় পাওয়া যেত। এই ছাড় এবারে বারো লক্ষ টাকা ও স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকসন ৭৫ হাজার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বলেছেন এতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুবিধা পাবে। এর ফলে উক্ত আয়ের জনগণের মাসে পাঁচ হাজার টাকার মত হাতে থাকবে ও তার ভোগ্যপণ্য কিনবেন।বাজারে চাহিদা তৈরী হবে ও জিডিপি বাড়বে। কিন্তু হিসাব কষে দেখা গেছে সমাজের ওপরের

তলার ১০ শতাংশ আয়করদাতাদের সর্বাধিক লাভ হবে। দেশে যে তীব্র আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে মোদীর আমলে তা আজ প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতিবিদরা তো এব্যাপারে গবেষণা করে রিপোর্ট তৈরী করেছেন। দেশের মানুষও তা বুঝতে পারছেন। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা কমেছে।গরীব, উচ্চবিত্ত ও ধনী পরিবার বেড়েছে। আয়করদাতা দেশে মাত্র ৩ শতাংশেরও কম,মোটামুটি ৩.২ কোটি। তার মানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ আয়করের এই ছাড়ে উপকৃত হবেন।

মনে রাখতে হবে ভারতে মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন,যার অধিকাংশ নিল রিটার্ন, এরা কোন আয়কর দেন না। ফলে এই ব্যবস্থায় উপকৃত হবে মেরেকেটে ৭০/৮০ লক্ষ মানুষ যারা আয়করের আওতার বাইরে চলে যাবেন। বাকি আড়াই কোটির মত আয়করদাতার ওপর থেকে করের বোঝা কমবে।এদের মধ্যে সওয়া দুই শতাংশ আয়করদাতার আয় এক কোটি টাকার বেশী। এমনকি ১০০ বা ৫০০ কোটি টাকা আয়ের মানুষও বেশ কিছুটা ছাড় পাচ্ছেন।অথচ এদের ওপর বেশী হারে কর চাপালে অনেকটা বেশী রাজস্ব আসত সরকারের ঘরে। সরকার বলেছে এই ছাড়ের পর এক লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব কম আসবে। এই এক লক্ষ টাকার ঘাটতি মেটাতে সরকারকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করতে হয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১৫,০০০ টাকার কম। এদের সরকারি সাহায্যের সবথেকে বেশী প্রয়োজন। কম পয়সায় শিক্ষা,চিকিৎসা, গণবন্টন ব্যবস্থা, নূনতম মজুরিতে কর্মসংস্থান, জেন্ডার বাজেটিং ইত্যাদি। যা পণ্ডিত নেহেরুর সময় থেকে ড .মনমোহন সিংহের আমলে দেখতে পাওয়া যেত। পেট্রোপণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যে জিএসটির হার কমালে দেশের সব ধরনের মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছত। মনে রাখতে হবে পাড়ার একজন ভিখারিও সরকারকে পরোক্ষ কর দেয় , জিএসটির মাধ্যমে। তাদের জীবনের মানোন্নয়নের দিকটা এই সরকারের ধর্তব্যের মধ্যেই আসে নি। ❐

পাড়াগাঁয়ের ভবিষ্যৎ

অশোক সরকার

প্রথম খটকা লেগেছিল কোভিডকালে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের তথ্য দেখে। কৃষির বিকাশ ৩.৬%, আর দেশের অন্যান্য সব কটি উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ -৬% বা তারও নিচে। মানেটা কি? দেশের উন্নতির যে সব দিক নিয়ে সারাক্ষণ বুক ফুলিয়ে গলা কাঁপিয়ে গর্ব করা হয়, সেই তথ্য প্রযুক্তি, নির্মাণ, রপ্তানি, পরিষেবা, স্টার্ট আপ, সব ফেল, পাশ একমাত্র কৃষি? খটকার আরও কারণ ছিল। একাধিক সার্ভে দেখাচ্ছিল যে ধারাবাহিকভাবে কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু খটকার সব থেকে বড় কারণ ছিল কিষাণ আন্দোলন। কবে শুনেছেন শহুরে কোন পেশার ব্যক্তিরা একটানা ঘরবাড়ি, কাজকর্ম ছেড়ে চরম ঠাণ্ডা গরমের মধ্যে রাস্তায় বসে এক বছর চার মাস ধরে আন্দোলন করতে পেরেছে? এত শক্তি কোথা থেকে আসে? কিষাণ আন্দোলন শুরু হবার কয়েক মাস আগেই সারা দেশ দেখেছে কয়েক কোটি শহুরে শ্রমিকের পলায়ন। এঁরা ছিলেন সেই শ্রমিক, যারা গত কুড়ি বছর গ্রাম ছেড়ে শহরে খুঁজেছিলেন ভবিষ্যৎ। তাঁরা দেখেছিলেন গ্রামে তাঁদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, যা আছে, তা একমাত্র শহরেই।

খটকাটা এই যে আমাদের জাতীয় ও স্থানীয় কথোপকথনে বিভিন্ন সময়ে স্ববিরোধী ছবি আঁকা হয়েছে। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই গ্রামজীবনের মধ্যে শুধু বেঁচে থাকার নয়, পূর্ণ বিকাশের প্রাণশক্তি দেখেছিলেন, মহাত্মা তো দেশের ভবিষ্যৎ কল্পনায় শহরসভ্যতাকেই ত্যাগ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা না করলেও শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনকেও তার নিজস্ব শক্তিতে পুনর্গঠনের ডাক দিয়েছিলেন। কিষাণ আন্দোলনের সময় বারবার রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তির ধারণার কথা মনে পড়ছিল। অন্যদিকে আম্বেদকর গ্রামীণ জীবনকে দুর্গন্ধময় পঙ্কিল আখ্যা দিয়ে এক অর্থে গ্রামের বিনাশ দেখতে চেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও এই পরস্পর বিরোধী ভাবনার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ জীবনের শোষণ ও বঞ্চনার কাহিনী শুনিয়েছেন, বিভূতিভূষণ শুনিয়েছিলেন ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম সমাজ ও গ্রাম থেকে শহরে আসার কাহিনী, আর তারাশঙ্করের লেখনীতে আমরা পেয়েছিলাম, গ্রামীণ জীবনের নানা পাঁকের কথা। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, ৫০ এর দশকের পরে বাংলা সাহিত্যের মুল উপাদানগুলি আর গ্রামে রইল না, শহুরে হয়ে গেল। গত চল্লিশ বছরে একটাও বাংলা চলচিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার মূল চরিত্রে আছে এক জন চাষি।

সাহিত্য ছেড়ে দেশের নীতির দিকে তাকালে দেখি ৫০-এর দশকে গ্রামোন্নয়ন (তখন বলা হত কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট) নামে এক বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হচ্ছে, ৭০ বছর পরেও দেশের ও রাজ্যের বাজেটে সবচেয়ে বেশি টাকা এই খাতেই খরচা হচ্ছে। পাশাপাশি ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে একটা স্ববিরোধী চিত্র সামনে আসে। শহরকে ধরেই নেওয়া হচ্ছে উন্নত, আর গ্রামের ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। গ্রাম হল পিছিয়ে পড়া, শহর আছে এগিয়ে। এই দ্বিভাগিতা (বাইনারি) মূলত ভারতের উপনিবেশিক উত্তরাধিকার। কিন্তু গ্রামোন্নয়ন মানে এই নয়, গ্রামও শহরের মতই অর্থনীতির কেন্দ্র হবে। গ্রামোন্নয়ন মানে ধরে নেওয়া হল ফসলের উদ্বৃত্ত উৎপাদন, আর তার সঙ্গে গ্রামের মানুষের জীবিকার সুরক্ষা, আর একেবারে ন্যুনতম পরিকাঠামোর ব্যবস্থা। গ্রাম হবে শহরের খাদ্য সরবরাহকারি আর লেবার সাপ্লাইকারি।

কৃষি সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় নীতি ছিল সবুজ বিপ্লব। সবুজ বিপ্লবের ফলে দেশের খাদ্য উৎপাদন অনেক বাড়ল, খাদ্য সঙ্কট থামানো গেল, কিন্তু গ্রামে অনাহার রয়েই গেল। এর সঙ্গে ভূমি সংস্কারকে ভুললে চলবে না। গ্রামকে শিকড় থেকে বদলাতে হলে ভূমি সংস্কারের কোন

বিকল্প ছিল না। ভূমি সংস্কার আইন হল, বক্তৃতা হল, কিন্তু দেশের অধিকাশ রাজ্যে ভূমি সংস্কার হল না। কিন্তু গ্রামীণ জনসংখ্যা বাড়তে থাকায়, ব্যক্তিপিছু জমি কমতে লাগল, আর তার থেকে উৎপন্ন হল উদ্বৃত্ত শ্রমিক, যারা শহরে এসে ভিড় জমাল। গত ১০০ বছরে দেশের জনসংখ্যার মধ্যে শহরবাসীর অনুপাত ১০ থেকে ৩২ হয়েছে, কিন্তু তার বড় অংশ আসলে গ্রাম থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক। ৯০-এর দশকে এসে খাদ্য উৎপাদন আর বাড়ল না, কৃষকের আত্মহত্যা বাড়ল। ৫০ বছর পার করেও গ্রামোন্নয়নের মূল লক্ষ্য রয়ে গেল গ্রামীণ মানুষের জীবিকার সুরক্ষা, যে লক্ষ্যের ইংরেজি নাম livelihoods security, পাশাপাশি দেশের জন্য খাদ্য সুরক্ষা। গ্রামের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের শিকড় সমাজের গভীরে নিয়ে যেতে ৯০-এর দশকে নিয়ে আসা হল রাজনৈতিক ও শাসন-কাঠামোর সংস্কারের প্রয়াস, যার অন্য নাম গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ বা পঞ্চায়েতি রাজ। সেই সংস্কারেরও একই হাল হল, দেশের বেশির ভাগ অংশে তা রয়ে গেল খাতায় কলমে।

নতুন শতাধীতে এসে গ্রামের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একাধিক তথ্য দেখাচ্ছিল চাষি-র ছেলে আর চাষি হতে চাইছে না, অল্প বয়স্ক চাষি নেই বললেই চলে, ভারতীয় চাষির গড় বয়স ইতিমধ্যেই ৪৭ ছাড়িয়েছে। চাষের রোজগারে সংসার চলছে না, এবং গ্রামেও যাদের অবস্থা একটু ভালো তারা মূলত ব্যবসাদার, চাকুরে, দোকানি, কারখানার মালিক ইত্যাদি। সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন গ্রাম সমাজ বলতে আমরা যা বুঝতাম, গ্রাম সমাজের বিবর্তনের উপর প্রায় পাঁচ ডজন বিখ্যাত গবেষণা গ্রাম সমাজের যে ছবি আমাদের সামনে রেখেছিল তা লুপ্তপ্রায়। সেই সামুহিক বন্ধন নেই, স্থানীয় অর্থনীতি-স্থানীয় জীবিকার উপর নির্ভরতা গেছে কমে, জাতি ও পেশার পারস্পরিক কঠিন বাঁধনও আর নেই, গ্রামীণ সংস্কৃতিও আর গ্রামীণ নেই। গ্রামের মানুষের মনের জগতেও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে।

আঞ্চলিকভাবে ডিগ্রির তারতম্য থাকলেও এই ধারণার অন্তর্নিহিত সুরটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সত্যিই কি আমরা বুঝেছিলাম? তা পরীক্ষা করতে গেলে শহরের উন্নয়নের কাহিনীটা আগে একটু বলে নিতে হয়। শহরের উন্নয়ন বিষয়টা আশির দশক থেকে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। অদ্ভুতভাবে শহরী উন্নয়নের কল্পনার কাঠামোয় শুধুমাত্র মেট্রোপলিটান শহরগুলি স্থান পেল, আমাদের দেশে যে ৭০০-র বেশি জেলা শহর আছে, আরও কয়েকশ পর্যটন শহর , শিল্প শহর আছে, সেগুলি স্থান পেল না। ৬০০০-র উপর ব্লক-টাউন আছে, তার কথা ছেড়েই দিলাম। অর্থাৎ শহর বলতে দেশের এলিট শুধুমাত্র দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, বাঙ্গালোর ইত্যাদি কয়েকটা শহর বুঝল, তার বাইরে নয়, এবং শহরের উন্নয়নের সঙ্গে গ্রামের উন্নয়নের যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক আছে সেটা কোন কল্পনাতেই এলো না -- না গ্রামের ভবিষ্যতের কল্পনায়, না শহরের।

চারটি মূল ধারণা আমাদের উন্নয়ন কল্পনাগুলিকে আকার দিয়েছে। এক, শহর হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি, সেখানে যা করা হবে, তা মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মাথায় রেখে; দুই, গ্রাম হল মূলত দেশের খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি, তাই সেখানে যা করা হবে, তা মূলত উৎপাদককুলকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য; তিন, শহরের উন্নয়নের সঙ্গে গ্রামের উন্নয়নের কোন সম্পর্ক নেই, আর চার, শহরের উন্নয়ন মানে মেট্রোপলিসের উন্নয়ন। আমাদের চোখ খোলার জন্য উল্টো করে বলা দরকার -- শহরে সমাজ উন্নয়নের কোন দরকার নেই, গ্রাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র নয়, মেট্রোপলিসের উন্নয়ন দরকার, মিউনিসিপালিটির উন্নয়ন দরকার নেই। গ্রামকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা হলে গ্রাম ও মফস্বল শহরগুলিকে এক সূত্রে গেঁথে উন্নয়নের কথা ভাবতে হত। একটা ছোট্ট কাহিনী শোনালে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকে মহিলা চাষিদের এক চাষি কোম্পানি কাজ করছে। ২০০২ সালের প্রডিউসার কোম্পানি আইন অনুসারে চাষিরা সংঘবদ্ধ হয়ে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তৈরি করতে পারে। সেই অনুযায়ী এখন সারা দেশে ১২,০০০-এর বেশি চাষি কোম্পানি তৈরি হয়েছে, এই চাষি কোম্পানিটি তারই একটি। এই কোম্পানির প্রায় ২৭০০ জন শেয়ার হোল্ডার সবাই মহিলা, এবং তারা মাহাতো, মুরমু, সোরেন, বাস্কে পরিবারের সদস্য। এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা ছাড়াও আরও ৫০০০, অর্থাৎ প্রায় ৭৭০০ জন মহিলা চাষি কালো চাল, বাদামী চাল, বাদশাভোগ চাল, শালপাতার থালা, বাটি, কাঁচা হলুদ উৎপাদন করেন এবং চাষি কোম্পানিকে বিক্রি করেন। চাষি কোম্পানি সেগুলি স্থানীয় বাজারে এবং অন্য রাজ্যের ব্যবসায়িক সংস্থাকে বিক্রি করে। চাষ হয় সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে; গত তিন বছর ধরে এই কোম্পানির অরগানিক সার্টিফিকেট আছে। কোম্পানির নিজস্ব চালকল আছে, শালপাতার থালা বাটি তৈরির কারখানা আছে, এখন কাঁচা হলুদ থেকে হলুদ পাউডার তৈরির কারখানা বসাচ্ছে। কারখানাগুলি মহিলারাই চালান। বছরে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকার ব্যবসা করে এই কোম্পানি। তারা যে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তার কয়েকটি উল্লেখ করলেই ছবিটা পরিষ্কার হবে। থালা, বাটি তৈরির মেশিন কলকাতা থেকে এসেছে, সেগুলি হাইড্রলিক হটপ্রেস মেশিন, অতি সাধারণ কারিগরিতে তৈরি। মেশিন মাঝে মাঝেই বিগড়ায়, তখন কলকাতা থেকে মেকানিক আনতে হয়। চাল কলের মেশিনগুলিও জটিল কিছু নয়, কিন্তু খারাপ হলে কলকাতার মেকানিক নির্ভর। থালা বাটি তৈরির কারখানায় ৪৪০ ভোল্ট চালিত চারটি মেশিন আছে, সব কটা একসঙ্গে চললে এলাকায় ভোল্টেজ কমে যায়, তখন লোকে ঝামেলা করে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির হিসাব নিকাশ, সরকারি নিয়ম পালন সাধারণ দোকানের হালখাতার চেয়ে অনেক জটিল। তার জন্য নির্দিষ্ট সফটওয়ার জানা শিক্ষিত হিসাবরক্ষক রাখতে হয়েছে, যাকে

পেতে দেড় বছর সময় লেগেছে। এই ৭৭০০ মহিলা চাষি নয়াগ্রাম ব্লকের ৬টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২টা গ্রামে ছড়িয়ে আছেন, প্রতি শুক্রবার এই গ্রামগুলি থেকে শালপাতা সংগ্রহ করতে একটা ছোট পিক আপ ট্রাক (চলতি কথায় বলে ছোট হাতি , টাটা ২০৭) বেরোয়। সব গ্রামে সেই গাড়ী ঢুকতে পারে না, মহিলারা মাথায় করে শালাপাতার বান্ডিল নিয়ে আসেন এক একটা রাস্তার মোড়ে। মরশুমি ধানও সেইভাবেই নিয়ে আসেন মহিলারা। অরগানিক সার্টিফিকেট পাবার জন্য চাষের জমি, বীজ, সার, ওষুধ, চাষ পদ্ধতি সংক্রান্ত বহু তথ্য রাখতে হয়, ও বহু ফর্ম ভর্তি করতে হয়, তার ইন্সপেকশন হয়। এছাড়া জৈব চাষ, জৈব সার, জৈব ওষুধ, বিশেষ প্যাকেজিং, শালপাতা গুদামজাত করা, তার হিসাব রাখা ইত্যাদি অনেক কিছু শিখতে হয়েছে এই মহিলাদের। এই সবেতেই তাঁদের পাশে আছে দাতা সংস্থার দান নির্ভর এক এনজিও। এই গ্রামগুলির কাছের মফস্বল শহর হল কেশিয়াড়ি, সেখান থেকে এই পুরো কর্মকাণ্ডে এক কণাও কিছু পাওয়া যায় নি, এমনকি ট্যালি (সবচেয়ে প্রচলিত আকাউন্টস সফটওয়ার) জানা বি-কম পাস ছেলে বা মেয়েও নয়। সরকারি কোন প্রকল্প থেকেও কিছু পাওয়া যায়নি।

আমাদের কল্পনায় যদি গ্রাম ও মফস্বল শহর এক সূত্রে গেঁথে উন্নয়নের কথা ভাবা হত, তাহলে প্রতিটা গ্রামে ছোট হাতি ঢোকার মত পাকা রাস্তা থাকত, নির্ভরযোগ্য ৪৪০ ভোল্ট লাইন টানা থাকত। কেশিয়াড়ি শহরে এই সব মেশিন সারাবার মেকানিক পাওয়া যেত, কাজ জানা হিসাব রক্ষক পাওয়া যেত, জৈব চাষ শেখার শেখার জন্য কৃষি ট্রেনিং সেন্টার থাকত, এই ধরনের ব্যবসার ম্যানেজমেন্ট শেখার জন্য বিজনেস স্কুল খড়গপুরে থাকত (নয়াগ্রাম ব্লক থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখবেন, সংগঠিত ক্ষেত্রে মাত্র ৫% সংস্থা আছে, এবং দেশের মোট কর্মীকুলের ২০% কর্মী সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে, কিন্তু সেই সংস্থাগুলি চালানোর জন্য ২৩টি বিজনেস স্কুল আছে। অন্যদিকে ৯৫% সংস্থাই অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত, আর সেখানে ৮০% কর্মী কাজ করে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য একটাও বিজনেস স্কুল নেই। যেমন একই ভাবে আমাদের চাষি তৈরির কলেজ নেই, আছে কৃষি দপ্তরে আর চাষবাস সংক্রান্ত কোম্পানিগুলিতে চাকরিতে ঢোকার জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এই একই যুক্তি অন্য ক্ষেত্রেও খাটে। তথ্য বলে দুধ, চাল, কলা, আলু, গম, আখ, সবজি, এবং কাপাস উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে ১ থেকে ৩ নম্বর স্থানে আছে। কিন্তু এর পরের স্তরে অর্থাৎ গুদামজাত করা, ফসল সংরক্ষণ, সারা দেশে তার পরিবহন, চাষিদের কাছে সারা দেশের বাজার খুলে দেওয়া, প্রসেসিং, গুনমান উন্নত করা, প্যাকেজিং, চাষিদের অনুকূলে বাজার তৈরি --- দুধকে বাদ দিলে বাকি সব কটিতে এই সমস্ত বিষয়ে আমরা ফেল। অর্থাৎ দুধে যা করা গেছিল, তার থেকে আমরা শিক্ষা নিইনি।

শহর উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই কাহিনী। প্রায় ১৫০০টি মিউনিসিপ্যাল টাউন আছে, যার অনেকগুলিই মেট্রোপলিসগুলি থেকে পুরনো। অথচ আমাদের শহরী উন্নয়ন কল্পনায় তাদের কোন স্থান হয় নি, এই টাউনগুলির কোন ভবিষ্যৎমুখী ভিশন নেই। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি মূলত রক্ষণাবেক্ষণের মানসিকতায় চলে। মেট্রোপলিটান অথরিটির মত কোন ম্যুনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তৈরি হয় নি। একটা উদাহরণ দেই ; ওরচা মধ্যপ্রদেশের অন্যতম পর্যটন শহর, খাজুরাহর পরেই তার স্থান। সেখানে আছে জাহাঙ্গীরের মিত্র বুন্ডেলা রাজপুত রাজাদের দুর্গ, ৮০০ বছরের পুরনো মসজিদ মন্দির, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী বেতোয়া, আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক দর্শন স্থান। অপূর্ব সুন্দর এই ছোট্ট শহর। শহরে বছরে তিনবার উৎসব হয়, কয়েক হাজার টন ফুল ব্যবহার হয়। ওরচা শহরের চারপাশে আছে ৬টি গ্রাম, ছটি গ্রাম পঞ্চায়েত। একটি গ্রামেও ফুলের চাষ হয় না। ফুল আসে ১৫ কিলোমিটার দূরে ঝাঁসি শহরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। ওরচা শহরের জঞ্জাল দুটি গ্রামের খালি জমিতে ফেলা হয়, তাই নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোমালিন্য। ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘুরে ঘুরে মানুষকে জিগ্যেস করেছিলাম, এত বড় পর্যটক টাউন তাদের জীবনকে কি দিয়েছে? অল্প কিছু হকার বলেছিল তারা উৎসবের সময় রোজগার পায়। তাছাড়া বিশেষ কিছু নয়। মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসককেও একই প্রশ্ন করেছিলাম, উত্তরও একই ছিল। মিউনিসিপালিটি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কোনদিন একসঙ্গে কোন মিটিঙে বসেনি। শুধু একবার জঞ্জালের দুর্গন্ধ নিয়ে গ্রামের লোকেরা প্রতিবাদ করেছিল তখন একবার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান গ্রামে এসেছিল।

ভারতের প্রায় ১৫০০টি মিউনিসিপালিটির মধ্যে এমন কোন মিউনিসিপালিটি খুঁজে পাওয়া যাবে কি যারা তাদের চার পাশের গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিকে নিয়ে একসঙ্গে আগামী ৩০ বছরের পরিকল্পনা করেছে? এমন কোন সরকারি বা বেসরকারি নগর উন্নয়ন গবেষণা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি আছে যারা এই ধরনের ভবিষ্যতমুখী উন্নয়ন ভাবনা কি করে ভাবতে হয় তা শিখিয়েছে? উত্তরটা আমাদের সকলেরই জানা। এই প্রসঙ্গে স্মার্ট সিটির কথা ওঠে। স্মার্ট সিটির ভাবনা কি রকম, তা নিয়ে যে এক ডজন উপস্থাপনা দেখেছি, তার সবই নগর উন্নয়ন কন্সাল্টান্ট কোম্পানির তৈরি -- ফ্লাইওভার, হাইওয়ে, ওয়াই-ফাই, বিনোদন পার্ক, শপিং মল, কিছু আলংকারিক আলোকসজ্জা ছাড়া তার অন্য কোন ছবি পাইনি। এই রকম একটা স্মার্ট সিটি উপস্থাপনা হয়েছিল অন্ধ্র প্রদেশের কুরনুল শহরে। ঘটনাচক্রে সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। কুরনুল শহরের দুপাশ দিয়েই তুঙ্গভদ্রা নদী, কিন্তু শহরে জলকষ্ট। স্মার্ট সিটির উপস্থাপনা শুনে কোট-টাই পরা কন্সাল্টান্টগুলিকে জিগ্যেস করা হল, যে শহরের দুপাশ দিয়েই নদী, সেই শহরে জলকষ্ট দূর করার কি পরিকল্পনা আছে তোমাদের? আগামী পঞ্চাশ বছরে এই শহর কতটা বাড়বে, কত লোক আসবে, তাতে আশে পাশের গ্রামগুলিতে কি প্রভাব পড়বে? উত্তর জানা নেই, কারণ প্রশ্নটাই সিলেবাসের বাইরে।

স্মার্ট সিটির পাশাপাশি, এবং কিছুটা বিপরীতে আরেকটি ধারনা উঠে আসছে। তাকে বলা হচ্ছে সমর্থ জেলা। ১৫০০ মিউনিসিপ্যালিটি, আড়াই লক্ষ গ্রাম, ৬০০০ ব্লক টাউন, সবই এই জেলার খাঁচার মধ্যে পড়ে। উন্নয়নের মুল কাঠামো যদি রাজ্যের রাজধানী আর মেট্রোপলিস না হয়ে জেলা হয়, তাহলে গ্রাম আর শহরকে এক্ সূত্রে গেঁথে উন্নয়নের কথা ভাবা যেতে পারে। তার জন্য বিশেষ বিজনেস স্কুল লাগবে, বিশেষ টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সিটিউট, বিশেষ ধরনের টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ইন্সিটিউট, এবং গ্রাম-নগর উন্নয়নের সামগ্রিক শিক্ষা, গবেষণা, সরকারি কর্মসূচি লাগবে। কোনটাই রকেট সায়েন্স নয়। ❐

লেখক ব্যাঙ্গালুরুর উইপ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

কেন্দ্রের বাজেট ব্রাত্য পরিবেশ, ব্রাত্য শ্রমজীবী

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারামনের পেশ করা বাজেট নিয়ে ভারতজুড়ে নানান আলোচনা চলছে। এসব আলোচনার মধ্যে কখনো এ কথাটা উচ্চারিত হলো না, আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট নিয়ে কী কী পদক্ষেপ বা কার্যসূচি হাতে নেওয়া হল। আজ দেশে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার। কোন শহর, কোন গ্রাম বা কোন এলাকাতেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আইন কার্যকর হয় না। বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য যাঁরা করেন তাঁরাও প্রতিদিন ধাপে ধাপে মৃত্যুর দিকে এগোন। কয়েকদিন আগেই কলকাতায় একটি বড় ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে তিনজন শ্রমিক মারা গিয়েছেন। এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। সুপ্রিম কোর্ট বলা সত্ত্বেও আইন থাকা সত্ত্বেও, ভারতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কখনোই কিছু করা হয়নি। এমনকি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত যেসব শ্রমিক রয়েছেন, তাঁরা ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন।

ভারতের উত্তর-পূর্বের দুই-একটি নদী বাদ দিলে প্রতিটি নদী দূষিত। দেবালয় হবে, মন্দির হবে, মসজিদ হবে; সব কিছু হবে, কিন্তু নদী পরিষ্কার হবে না। এটাই আমাদের দেশের সার্বিক চিত্র। কেন্দ্রীয় বাজেটে নদী সংস্কার বা পরিষ্কার করা নিয়ে কোন কথা বলা হল না। ভূ-উষ্ণায়ন নিয়ে কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কথা বারবার বলা হচ্ছে। উষ্ণায়নে সবচেয়ে আক্রান্ত কারা? যাঁরা বিভিন্ন উপকূল অঞ্চলে বাস করেন এবং সুন্দরবন এর দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ। অথচ বাজেটে এই নিয়ে কোন বক্তব্য নেই। পশ্চিমবঙ্গের চারিদিকে ঢালাও বেআইনি বাজি কারখানা এবং শিশুমৃত্যু মিছিল চলছে।

এবারে অন্য আর একটি বিষয়ের দিকে তাকানো যাক। যে সমস্ত মানুষের বাৎসরিক আয় ১২ লক্ষ টাকা, তাঁদের কর ছাড় দেওয়া হয়েছে বাজেটে। এ নিয়ে বেশ কিছু মানুষ উৎফুল্ল। কিন্তু যাঁরা বছরে এই ১২ লক্ষ টাকা আয় করতেই পারেন না? যাঁরা গোটা বছরে ১ লক্ষ টাকাও উপার্জন করতে পারেন না? তাঁরা কারা? তাঁরা আমাদের দেশের অগণিত প্রবীণ নাগরিক। যাঁরা মাসে পেনশন পান মাত্র এক হাজার টাকা। অর্থাৎ বছরে তাঁদের মোট পেনশন ১২ হাজার টাকা। আর কিছু কিছু মানুষ আছেন বছরে যাঁদের পেনশন দাঁড়ায় সাকুল্যে ২৪ হাজার টাকা। যে সমস্ত মানুষ বছরে পেনশন বাবদ ১২ থেকে ২৪ হাজার টাকা পর্যন্ত পান, তাঁদের পেনশন বাড়ানো হল না। আর এদিকে আমরা ১২ লক্ষ টাকার কর ছাড়ের মাত্রা নিয়ে কত না চর্চা করে চলেছি! দেশে অনেক প্রবীণ নাগরিক আছেন, যাঁদের এই পেনশনটুকু পর্যন্ত নেই। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যসভার সাংসদ শ্রীমতি জয়া বচ্চন প্রবীণদের এই দুরবস্থা নিয়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু ভাষণ তো হল, তা কার্যকার কবে হবে? ট্রেনে সফর করলে প্রবীণরা টিকিটে সামান্য ছাড় পেতেন। সেটাও করোনার নাম করে ধরে তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা সবাই কি আনন্দেই না মেতে রয়েছি; 'বন্দে ভারত' চলছে!

তাই আগেও আমরা কেন্দ্রীয় বাজেটে যেমনটি দেখেছি যে, গরিব মানুষ সেখানে ব্রাত্য থেকে গিয়েছিল, শ্রমজীবী মানুষ সেখানে ব্রাত্য থেকে গিয়েছিল, প্রবীণ মানুষ সেখানে ব্রাত্য থেকে গিয়েছিল -- আজও সেই একই ট্রাডিশন সমানে চলছে। বর্তমান বাজেটেও ভারতের অগণিত জনগণ ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন। এরপরেও জনপ্রতিনিধিরা সংসদে গালভরা নানান কথাবার্তা বলবেন। আমরা শুনবো। অথচ কেউই কিছু করবো না। শেষ কথা বলতে হয় যে, পথে এবার নামো সাথি, পথেই হবে পথ চেনা। এই পথে নেমেই পথ চিনতে হবে যে, সঠিক কোন লক্ষ্যে কাদের ক্ষমতায় আনতে হবে। তাই পথ চিনে নেওয়াটা বড় জরুরি। এটা না করতে পারলে সমস্ত ভারতজুড়ে গরিব মানুষের দুর্দশা কখনোই ঘুচবে না। আর পরিবেশের সর্বনাশ যেমনটি হচ্ছে, তেমনটিই হতে থাকবে। ❐

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়ি ধ্বংস করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

শুভ বসু

শেখ মুজিব সে যুগেরবাঙালি মুসলমান উদ্ভিন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের সামূহিক সত্ত্বা ছিলেন। তাঁর কৈশোর এবং যৌবন কেটেছিল ভারতেব স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে। তিনি সে যুগের মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কৈশোরে তিনি সুভাষ বসুরআদর্শের অনুগামী এবং যৌবনে যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তথা বাঘাযতীনের শিষ্য অবিভক্ত ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের বিপ্লবী পূর্ণ চন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি তথাকথিতঅর্থে ভালোছাত্র ছিলেন না। কিন্তু

রাজনীতির এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে তিনি উৎসাহী ছিলেন। ব্রতচারী সংগঠনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালেই তাঁর সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দির পরিচয় হয় এবং তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দির ব্যক্তিত্বর প্রতি আকৃষ্ট হন। কলকাতায় পড়তে এসে শহীদ সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে যুক্ত হন। মুসলিম ছাত্রলীগের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। কলকাতার ইসলামিয়া মহাবিদ্যালয় ছিল মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মকেন্দ্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর সময়ে বাংলার ঔপনিবেশিক সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে কৃষকরাআন্দোলন করেছেন। কলকাতার ছাত্ররা রশিদ আলী দিবসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেআন্দোলন করেছেন।শরৎ বসু , শহীদ সোহরাওয়ার্দি এবং সোমনাথলাহিড়ী কলকাতায় সভা সমাবেশ করছেন।শেখ মুজিব তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছিলেন। সেই সময়েআবুল হাসিমের নেতৃত্বেবাংলার মুসলিম লীগের একটি প্রগতিশীলগোষ্ঠী তৈরী হয়। তাঁরাবাংলার মধ্যে একটিশোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজেররূপরেখা তৈরী করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মতেরঅমিল ছিল মৌলানা আক্রম খান , খাজা নাজিমুদ্দিন , ইস্পাহানি এবং নুরুল আমিনদেরগোষ্ঠীর। সেই বিরোধ ছিল শ্রেণীগত অবস্থানের।আবুল হাসিম , আবুল মসুরআহমদ এবং আসামের মাওলানা আধুল হামিদ খান ভাসানী এঁরা সকলেই ছিলেন উদ্ভিন্ন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেনীর প্রতিনিধ। সেই সময়থেকেই তরুণদের মধ্যে কামরুদ্দিন আহমদ , তাজউদ্দীন আহমদ , মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখের ইচ্ছে ছিল একটি গণসমাজতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রী সমাজ গঠনের।

শেখ মুজিব বৌদ্ধিক মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন অগ্রণী আন্দোলনের কর্মী। তিনি বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদেরত্রাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতার দাঙ্গার সময়ে দাঙ্গা প্রতিহত করার প্রয়াস করেন। আবার সংযুক্ত স্বাধীন বাংলার আন্দোলনে যুক্ত হন সোহরাওয়ার্দি , আধুল হাসিম , শরৎ বসু এবং কিরণ শংকররায়ের সঙ্গে। স্বাধীনতার সময়ে শেখ মুজিব তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ সকলেই একটি শোষণ মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পাকিস্তান কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের স্বৈরশাসন এবং মৌলানাআক্রম খান , নাজিম উদ্দিন এবং নুরুল আমিনের এবং পাকিস্তানের অনির্বাচিত আমলাশাহির বিরুদ্ধে যেআন্দোলন তৈরী হচ্ছিলো শেখ মুজিব ছিলেন তাঁর সৈনিক। তিনি আন্দোলনের রাস্তায় মৌলানা আধুল হামিদ খানের সঙ্গে ছিলেন। মৌলানা আধুল হামিদ খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী মুসলিম লীগ তৈরিতে তাঁর ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি গ্রেফতার হন। ফলে তিনি ১৯৫২ সালে ছাত্র আন্দোলনে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারআন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন গণতন্ত্র আন্দোলনের সমর্থনের লক্ষ্যে। তাঁর অভিজ্ঞতা খুব সুখকর ছিল না। ১৯৬৬ সাল থেকে তিনি স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় তরুণ ছাত্ররা যাঁদের মধ্যে সিরাজুল আলম খান এবং কাজী আরেফ অন্যতম তাঁরা শেখ মুজিবেব. আন্দোলনে যোগ দেন এবং শেখ মুজিবের গ্রেফতারির পরে সেই ছাত্ররাই তাঁর আন্দোলন কে এগিয়ে নিয়ে যান। তবে তিনি চাইতেন পাকিস্তান একটি কনফেডারেশন হবেআর সিরাজুল আলম খানের অনুগামী ছাত্ররা চাইতেন স্বাধীনতা।শেখ মুজিব তাঁর জীবন বাজি রেখে এই আন্দোলনে জড়িয়েছিলেন। তাঁর কারা মুক্তির কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

১৯৬০ এর দশকের বৈশ্বিক ছাত্র শ্রমিক আন্দোলনের এবং উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ পাকিস্তানে এসে লাগে। পাকিস্তানে গণতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধিকারের দাবিতে যে গণ অভ্যুত্থান হয় ছাত্র শ্রমিক জনগণের নেতৃত্বে পূর্ববাংলায় তার প্রতীকী নেতায় পরিণত হন শেখ মুজিব। তাঁর প্রতীকী গুরুত্ব বুঝে মৌলানা আধুল হামিদ খানের মতো বামপন্থী নেতারাও তাঁকে সমর্থন দেন যদিও সেই সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্টআন্দোলনের দ্বিধা বিভক্ত অবস্থার জন্যে ন্যাশনালআওয়ামী পার্টি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রমিক কৃষক এবং ছাত্র জনতা আন্দোলন করছেন। সেই আন্দোলনের জন্যে শেখ মুজিব হয়েওঠেন বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর।

১৯৭১ সালের নির্বাচনে তিনি পাকিস্তানের সংবিধান সভার একক সংখ্যা গুরু দলের নেতা হন। ফলে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিত্বের উপরে তাঁর ন্যায্য দাবি ছিল। তিনি ভেবেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধিকার অর্জন করবেন। তাঁর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের যে কথাবার্তা হয় সেদিকে তাঁর ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর কর্ত্তা হয়ে দাঁড়ান চীন এবং আমেরিকার মধ্যে বন্ধুত্বের কূটনীতির নিয়ামক। ফলে তাঁরা মনে করেন পাকিস্তান প্রশাসন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ করলে মার্কিন প্রশাসন তাঁদের বিরোধিতা করবেন না। সেই কারণে তাঁরা ২৫ শে মার্চআক্রমণ করেন। ছাত্ররা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতকামী শক্তি সেই আক্রমণের প্রতিরোধের চেষ্টা করলো শেখ মুজিব ভারতে যেতে রাজি হননি। কারণ তিনি মনে করতেন ভারতের উপর অতিরিক্ত নির্ভর হয়ে যাবে আন্দোলন। এবং তাঁর প্রতীকী নেতৃত্ব ভেঙে পড়বে।পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর অধ্যক্ষরা যে দাবি করেন তিনি ২৫ মার্চের আক্রমণের সম্বন্ধে জানতেন তার কোনো সমর্থনযোগ্য আন্তর্জাতিক তথ্য আমি পাই নি। ফলে শেখ মুজিবের কারাবরণ ছিল একান্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা, তাজ উদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম কামরুদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন মনসুরআলীর নেতৃত্বে সরকার গঠন এবং খন্দকার মোস্তাক এবং শেখ মনির বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সেই সরকারের এবং মুক্তি বাহিনীর সেনাপতি ওসমানী, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশারফ, শফিউল্লাহর এবং ক্যাপ্টেন দত্ত'র সামরিক তৎপরতাতে এবং ভারতের সহযোগিতায়

বাংলাদেশ মুক্ত হয়। সেই মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্রদের। শেখ মুজিব ছিলেন সেই মুক্তি সংগ্রামের প্রতীকী নেতা।

আন্তর্জাতিক ঠান্ডা যুদ্ধর পরিস্থিতি , বিশ্ব তেল সংকট, দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ বিধস্ত দেশের রাস্তা ঘাটের অবনতি, উদ্বাস্তু সমস্যা, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মাস্তানি , অর্থিনীতিবিদদের এবং আন্তর্জাতিক মহলের সমাজতন্ত্রী দেশের চাপের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে, ভ্রান্ত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে দুর্ভিক্ষ হয় এবং দেশে এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা হয় । তার দায়িত্ব শেখ মুজিবের উপর পরে। তবে সেই সময় বিপ্লব করার নাম যে রাজনৈতিক edventurism তৈরী হয় এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে দেশের অভ্যন্তরে যে আর্থ-সামাজিক অবনতি হয় সে কথাও উল্লেখ্য। এততস্বত্তেওশেখ মুজিবেরবাংলাদেশথেকে ভারতের মিত্র বাহিনী সরানো এবং ভারতের নিষেধ না শুনে লাহোর বিশ্ব ঐস্লামিক সম্মেলনে গিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংঘের সদস্যপদ জোগাড় করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ভূমিকা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে বাংলাদেশের স্বাধিকার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁদের বিরাট ভূমিকা ছিল শেখ মুজিবর রহমান ও চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুরআলী সকলেই ঘাতকদের হাতে নিহত হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় মুক্তি সংগ্রামী খালেদ মোশারফ ,জিয়াউররহমান, কর্নেল তাহের সবাইআত্মঘাতী সংঘর্ষে ঘাতকের হাতে মারাগেছেন।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক বাড়ি ধ্বংস করা এবং তাতে একদল তরুণের খেলাফতের পতাকা উড়িয়ে অংশ গ্রহণ একান্ত নিন্দনীয় ঘটনা। পিনাকী ভট্টচার্য্যের ধারাভাষ্যে ছাত্রদের উত্তেজিত করা অতীব দুঃখ জনক ঘটনা।

আমি সামাজিক মাধ্যমে খুব বেশি প্রতিবাদ দেখি না।বাংলাদেশের ইতিহাসেরছাত্র হিসাবে , রাজনৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ মানুষ হিসাবে এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক সুহৃদ হিসাবেআমি তীব্র প্রতিবাদ করি এই ঘটনার।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ দুনিয়ার মজদুর এক হও ❐

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে যা কিছু প্রথম

কানিজ ফাতিমা

---

১. একুশের প্রথম কবিতা : একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে প্রথম রচিত কবিতা ‘কাঁদতে আসি নি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’। রচয়িতা মাহবুবুল আলম চৌধুরী। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭ টায় কবিতাটি রচিত হয়। কবিতাটি চট্টগ্রামের লাল দিঘি ময়দানে পরদিন২২ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যা ৭ টায় পাঠ করেন চৌধুরী হারুনুর রশিদ।

২. শহীদ মিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে প্রথম কবিতা’৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশের হাতে প্রথম শহীদ মিনার ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন ‘স্মৃতিস্তম্ভ’। ঐতিহাসিক এই কবিতাটির কয়েকটি চরণ-‘স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো/চারকোটি পরিবার/ খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য/ পারেনি ভাঙ্গতে।’

৩. একুশের প্রথম গান : ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম গানের রচয়িতা ভাষা সৈনিক আনম গাজিউল হক। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আর্মানিটোলা ময়দানের জনসভায় গানটি গাওয়া হয়। গানটির প্রথম চরণ হল, ‘ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না’।

৪. প্রভাত ফেরিতে প্রথম গান : ১৯৫৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রকৌশলী মোশাররফ উদ্দীন আহমদ প্রথম প্রভাত ফেরিতে গীত গানটি রচনা করেন। গানটির লাইন ছিল ‘মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে, আজকে স্মরিও তারে...’ ‘৫৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে লেখা হয়েছিল এ গান। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ লিখেছেন, ‘সেই সংগীতই হয়ে ওঠে অমর একুশের প্রথম বার্ষিকীর প্রভাতফেরির গান। আলতাফ মাহমুদের অপূর্ব সুর সংযোজন।

৫. প্রথম লিফলেট : ‘বিপ্লবের কোদাল দিয়ে আমরা অত্যাচারী, শাসকগোষ্ঠীর কবর রচনা করব।’ বুলেটিনে লিখেছিলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এটি ছাপানোর দায়িত্বে ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান।

৬. একুশের প্রথম সংকলন : একুশের প্রথম সংকলন ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ -সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। ‘৫৩ সালে পুথিপত্র থেকে এটি প্রকাশ করেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী মোহাম্মদ সুলতান।

৭. একুশের প্রথম স্মরণিকা : ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে ‘৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা শহীদের স্মরণে একুশের প্রথম স্মরণিকা। এ পুস্তিকাতেই ছাপা হয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা একুশের গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’।

৮. প্রথম নাটক : একুশের প্রথম নাটক মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’। মুনীর চৌধুরী ‘৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি নাটকটি লিখে শেষ করেন। ওই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি, রাত ১০টায় জেলকক্ষগুলোর বাতি নিভিয়ে দেওয়ার পর হ্যারিকেনের আলো- আঁধারিতে মঞ্চস্থ হয় কবর। অভিনয়ে অংশ নেন বন্দী নলিনী দাস, অজয় রায় প্রমুখ।

৯. প্রথম ভাষা শহীদ: একুশের প্রথম শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ।

১০. প্রথম শহীদ মিনার : ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ গভীর রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রনেতা গোলাম মওলা ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে স্তম্ভটি গড়ে তোলে প্রায় ৩০০ মানুষ। এদের বেশির ভাগই ছিলেন মেডিকেলের ছাত্র। ২৩ ফেব্রিয়ারি নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এই স্তম্ভের মূল নকশা করেছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বদরুল আলম।এটি ছিল ১১ ফুট লম্বা ত্রিস্তরবিশিষ্ট একটি স্তম্ভ।

তৈরির তিন দিন পর ২৬ ফেব্রুয়ারি স্বৈরশাসকের নির্দেশে মিনারটি শুধু ধ্বংসই করেনি পুলিশ, পাশাপাশি ধ্বংসাবশেষও নিয়ে যায় তারা।

১১. প্রথম উপন্যাস : একুশের প্রথম উপন্যাস জহির রায়হান রচিত 'আরেক ফাল্গুন'। শহীদ দিবস পালন, শহীদ মিনার নির্মাণ, আন্দোলন সবকিছুর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয় এই উপন্যাসে। উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পাঁচ এর দশকে এবং পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। '৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার মাত্র তিন মাস পর ভাষা আন্দোলন ও একুশের ইতিহাস নিয়ে লেখা হয় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস।

১২. প্রথম সিনেমা : একুশের চেতনা নিয়ে প্রথম নির্মিত সিনেমা 'জীবন থেকে নেয়া'। ১৯৭০ সালে জহির রায়হান সিনেমাটি পরিচালনা করেন।

১৩. ইউনেস্কো ১৯৯১ সালের ১৭ নভেম্বর মাসে বাঙালী জাতির ভাষার জন্য আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সালে প্রথমবারের মত ১৮৮ টি দেশে আমাদের শহীদ দিবস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। (সংগৃহীত) ❐

বাংলাদেশ বেঁচে থাকার শ্লোগান- 'জয় বাংলা'

মনিরুল হক

বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় অভ্যুত্থানের পর ছাত্র প্রতিনিধি এবং এন জি ও-দের সমন্বয়ে গঠিত সরকারের বয়স দেখতে দেখতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু সেই সরকার এখনও পর্যন্ত এমন একটিও কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করল না যেটি দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক অথবা আশাপ্রদ। আমরা দেখেছি, সব দেশেই নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরই মানুষের দুখ কষ্ট লাঘব করার বা জীবনমানের উন্নতি ঘটানোর জন্য তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে ও তা রূপায়ণের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু বাংলাদেশের এই নতুন সরকারের 'উইশ লিষ্ট'-এ যে ' জনগণ ' নেই তা আমরা জানতাম এবং প্রথম থেকেই আমরা তা বলে আসছিলাম।

বিগত ১৫ বছর আওয়ামী লিগ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিল। অনেক ভালো কাজের সঙ্গে অনেক খারাপ এবং জনবিরোধী কাজের দায়ও তাদের আছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, প্রতিবাদ অতীব যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না আওয়ামী বিরোধীদের মধ্যে যেমন আছে বিএন পি-র মত দল তেমনি আছে জামায়েত ইসলামির মত ধর্মান্ধ, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, শরিয়তী শাসন প্রবর্তনের জন্য উন্মুখ কট্টর ইসলামপন্থী দলও। আছে মধ্যপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ বাংলাদেশ এবং আরও কিছু বামপন্থী দল যাঁরা বরাবর ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থেকেছেন। কিন্তু এমনও কিছু বামপন্থী দল-গ্রুপ-ব্যক্তি আছেন যাঁদের অনেকেই ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কোনও অবস্থান নেন নি, উল্টে ভারত-বিদ্বেষ ও অন্যান্য অজুহাতে বাস্তবত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই করেছিলেন। কিন্তু কোটা সংস্কারের দাবির ন্যায্যতা আওয়ামী বিরোধী সবাইকে এক ছাতার তলায় এনে দাঁড় করিয়েছিল।

কিন্তু কোটা সংস্কার আন্দোলন আসলে ছিল সরকার ফেলে দেওয়ার এক চক্রান্তের অংশ। চক্রান্তের অংশ হিসাবেই আন্দোলন খুব দ্রুত সহিংস হয়ে ওঠে এবং সরকারকে বাধ্য করে আরও বেশি সহিংসতা দেখাতে। এটা ছিল সরকারের তরফে এক অবিমৃষ্যকারিতা। সাধারণ মানুষ আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং চক্রান্তকারীরা সেনাবাহিনীর সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এই চক্রান্তকারীরা বিদেশি সহায়তা পেয়েছে এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে বাংলাদেশের রাজনীতির আঙিনায় তাদের তেমন কোন পরিচিতি বা প্রভাব ছিল না বা এখনও নেই। বিগত ছয় মাস ধরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেও তারা জনসমর্থন বাড়াতে পারেন নি, বরং আন্দোলনের প্রথমদিকে যে সমর্থন তারা পেয়েছিল তা এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়েও তারা তাদের তথাকথিত বিপ্লবের 'অঙ্গীকার পত্র'ও প্রকাশ করতে পারে নি বা তাদের নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়াও আলোর মুখ দেখেনি।

আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, তাহলে তারা করছে টা কি ? তাদের আন্দোলনের সেই প্রথমক্ষণ থেকে তারা যে কাজটি নিরলসভাবে করে যাচ্ছেন, তা হল ১৯৭১ সালে সংঘটিত হওয়া মুক্তিযুদ্ধকে কলঙ্কিত করা। এরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই এদের সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আঁতুড়ঘর। এই সহজ সত্যটি যদি আমরা অনুধাবন করতে না পারি তাহলে আমরা বারবার প্রতারিত হব, যেমন হয়েছিলেন বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা সেই জুলাইয়ের দিনগুলিতে। সুকৌশলে জামাত বামপন্থী দলগুলির সাংস্কৃতিক কর্মীদের দিয়ে দেশাত্মবোধক গান গাইয়ে ছাত্রজনতাকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই চক্রান্তকারীদের মূল লক্ষ বাংলাদেশে কল্পিত 'খলিফাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা। আর এটুকু তারা জানে যে তাদের কল্পনায় বাতাস দেওয়ার জন্য বুঝে-না বুঝে অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়বেন তাদের কাতারে। কিন্তু তারা এটাও জানে, যতদিন ৭১ এর চেতনা বাংলাদেশের মানুষের মনে জাগরূক থাকবে, ততদিন তারা এক পা-ও এগোতে পারবেন না। যতদিন ৭১ এর অবিসংবাদীত নেতা মুজিবুর রহমান মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন ততদিন তারা ওই বিন্দু হয়েই বেঁচে থাকবে অথবা বিলীন হয়ে যাবে। তাই প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পরও তাদের মুজিবভীতি যাচ্ছেই না। এদের পূর্বপুরুষরা সেই ১৯৭৫ সালে সপরিবারে শেখ মুজিবর রহমানকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল কিন্তু এই উত্তরপুরুষরা

দিন-রাত-সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত চোখে দেখছে, বঙ্গবন্ধু তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পাহাড়ের মত। তাই তো ক্ষমতা দখলের এতোদিন পরেও ৩২ নং ধানমন্ডি বাড়িটি তাদের কাছে এক আতঙ্ক ! সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে ভেঙে ফেলা হল রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে থাকা এই ঐতিহাসিক বাড়িটি। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের গঠন, তার পথচলা ও তার অস্তিত্ব আবর্তিত হয়েছে এই বাড়িটি ঘিরে। আগামী দিনে শিকড়হীন এই প্রতারকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কেন্দ্রভূমিও হবে এই ৩২ নম্বর। ঠান্ডা মাথায় এই ৩২ নম্বরকে ধ্বংস করা আরও একবার প্রমাণ করে যে বর্তমান সরকার ১৯৭১ সালে সৃষ্টি হওয়া নতুন দেশ ক্ষুব্বাংলাদেশক্ষুব্ব এর অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চায়। শুধু তাই নয়; তারা বাঙালি পরিচয়, বাঙালি স্বত্বাও মুছে দিতে চায় । সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ভবন ও হলের ঢালাও নাম পরিবর্তনের কাজটা দেখলেই এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকার কথা নয়। ১৯ টি নামের মধ্যে যাঁরা এখনও কাতারে দাঁড়ানোর প্রিভিলেজ পাচ্ছেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম আর মধুসূদন দত্ত। আর অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা কোতল হলেন তাঁদের মধ্যে আছেন লালন সাঁই, সত্যেন বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জীবনানন্দ দাশ, সুলতানা কামাল, তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জয় বাংলা ভবন এবং অবশ্যই মুজিবর রহমান। 'শহীদ বুদ্ধিজীবী' যাঁরা দ্বিতীয় বার এই নয়া-রাজাকার জামানায় কোতল হলেন তাঁরা হলেন সুখরঞ্জন সমাদ্দার, গোবিন্দ চন্দ্র দে, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা এবং রাশিদুল হাসান। আর সরকার তাদের এইসব অপকর্মের অজুহাত হিসেবে শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ সরকারের নানা দুর্নীতি, অত্যাচার, বৈষম্য ও অগণতান্ত্রিকতাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। কিন্তু IRONY এটাই যে অন্যায়, হিংসা, নৃশংসতা, খুন, অনাচার, ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি, সংখ্যালঘু-বিদ্বেষ আর অপশাসনে এই অল্প ক'দিনেই নব্য রাজাকাররা পাকিস্তান আমলকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তারা যে আরও বেশি সাম্প্রদায়িক, আরও বেশি বিভেদপন্থী, আরও বেশি শরিয়তপন্থী এবং আরও বেশি মুক্তমনা বিরোধী তার প্রমাণ তারা প্রতিদিনই তাদের কথা-কাজের মধ্য দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছে। তাদের মিল খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে এপারের ট্((বাহিনীর সাথে। তাই বলা যায়, শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, আমাদের এই গোটা উপমহাদেশের জন্য বাংলাদেশের এই হঠকারী সাম্প্রদায়িক সরকার অত্যন্ত বিপজ্জনক এক পথ অনুসরণ করছে। আশার কথা, দেরিতে হলেও বাংলাদেশের মানুষ তাদের এই শয়তানি ধরে ফেলেছেন এবং বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতিস্বত্বা ও বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন তাঁরা নিজেরাই খাল কেটে কুমির এনেছেন। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি, পরের পর কারখানা, ব্যবসাস্থলে আগুন , ডাকাতি এবং লুটপাট, ছাঁটাই, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে নৈরাজ্য, একতরফা খুন দেশকে অধোগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরকারের সেই একদফা কর্মসূচি - আওয়ামী লিগ নিধন। আওয়ামী নিধন করার জন্য সরকার তার সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে। তাদের অত্যাচারে মানুষ অতীষ্ঠ। কিন্তু এতেই সরকার সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সরকার প্রধান মহম্মদ ইউনুস আবার নিদান দিয়েছেন, গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লিগকে খুজে বের করতে হবে এবং গ্রাম থেকে তাদের অস্তিত্বহীন করতে হবে। একথার মানে কি? তিনি প্রকাশ্যে নতুন মগ দস্যুদের নতুন করে উস্কানি দিচ্ছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছেন উপদেষ্টাদের মুর্শিদ ফরহাদ মজাহার সাহেব। তিনি সরাসরি এই নতুন মগ সংস্কৃতিকে সমর্থন জানিয়ে তার তাত্বিক ব্যাখ্যা পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন, ১৯৭১ সাল থেকে যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ধারা চালু হয়েছে তা ইসলামকে অবদমিত করে রেখেছে। তিনি বলেছেন, ইসলাম বিদ্বেষ ও ইসলাম নির্মুল-এর রাজনীতি বাংলাদেশের সেকুলার ফ্যাসিস্ট রাজনীতির মর্মবস্তু। তিনি নতুন মগ কালচারকে সমর্থন করে বলেছেন, 'তৌহিদি (ইসলামপন্থী/বিপ্লবী) জনতার প্রতিরোধ ও রণহুঙ্কর জুলাই আন্দোলনের স্পিরিট হিসাবেই হাজির হয়েছে। অর্থাৎ সেই একই তৌহিদি জনতা গাজিপুরে আওয়ামী লিগ নেতার বাড়ি আক্রমণ করছে, টাঙ্গাইলে লালন মেলা বন্ধ করে দিচ্ছে, লালনের গান বন্ধ করে দিচ্ছে ,ঢাকা বইমেলায় স্টল আক্রমণ করছে, সাতক্ষীর বইমেলার স্টলে ভাঙচুর করছে, আগুন দিচ্ছে, স্টল বনধ করে দিচ্ছে, আহমেদিয়া ও শিয়া মুসলমানদের উপাসনাস্থল আক্রমণ করছে , বাংলায় যে পীরদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম সমতার বাণী নিয়ে বিস্তার লাভ করেছিল , সেই পীরদের মাজারগুলির ওপর ক্রমাগত আক্রমণ হচ্ছে। কুমিল্লায় ইস্কনের নামগানের অনুষ্ঠানে যখন ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করছিল, তখন সেনাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে ভক্তদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারা হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা করে ' ইস্কন একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন।' ভাবা যায় ? ইউনুস প্রশাসন নীরব। গাজীপুরে জনতা প্রতিরোধ করেছে। এর পরই ইউনুস প্রশাসন ঘোষণা করেছে ' অপারেশন ডেভিল হান্ট ।' সেটা কি? সেটা হচ্ছে জেহাদি তৌহিদি Mob এর বিরুদ্ধে জনতা কোনো প্রতিরোধ করলে সেই Devil প্রতিরোধকারীদের। বাংলাদেশ Army গিয়ে উপযুক্ত শাস্তি দেবে।

কিন্তু মানুষ বাধ্য হয়েই প্রতিরোধের রাস্তায় নেমেছে। কি গ্রামে, কি শহরে সাধারণ মানুষ আর চুপ করে বসে থাকছেন। শহুরে শিক্ষিত মানুষও মোহমুক্ত হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে ফিরছেন। আনু মহম্মদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটি হামলা, নৈরাজ্য ও সরকারের নিস্ক্রিয়তার নিন্দা জানিয়েছে। বইমেলার দুটি ক্ষেত্রেই অত্যাচারীর ভূমিকায় দেখলাম সরকারের অনুগত নতুন মগ দস্যু 'তৌহিদি জনতা'র দল। আর নির্যাতিতরা ছিলেন জুলাই ছাত্র আন্দোলনের জোরালো সমর্থক। একটি ঘটনা হচ্ছে 'উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীকে নিয়ে। বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় তাঁদের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো আছে। সাতক্ষীরা বইমেলাতে তাঁদের স্টলে

আগুন লাগিয়েছে ইউনুস-ফরহাদ মজহারের তৌহিদি জনতা। স্টলও বন্ধ করে দিয়েছে। এই ঘটনায় উদীচী ভয় পায় নি। তাঁরা বেছে নিয়েছেন প্রতিবাদের রাস্তা। ঘটনার প্রতিবাদে তাঁরা ঢাকা শহর ও অন্যান্য সমস্ত জেলাতে প্রতিবাদ সভা করছেন। এদিকে কবি-লেখক-গীতিকার-গায়ক-অভিনেতা দম্পতি শতাধী ভব ও সানজানা মেহরানের সব্যসাচী নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা আছে। ঢাকা বইমেলাতে তাঁরা তসলিমা নাসরিনের 'চুম্বন' নামের একটি বই রেখেছিলেন বিক্রির জন্য। পুলিশ এবং বাংলা একাডেমি সেই বইটি সরিয়ে রাখতে বললে তাঁরা তা মেনেও নেন। তা সত্বেও আগে থেকেই ঘোষণা করে 'নারায়ে তকবির- আল্লাহ আকবর' শ্লোগানে বইমেলা কাঁপিয়ে সেই বইয়ের স্টল আক্রমণ করে তৌহিদি জনতা। স্টলে উপস্থিত শতাধী ভব একাই নতুন এই মগ দস্যুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। হয়ত বা মৃত্যুভয় তাঁকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। তিনিও মুহুর্মুহু উচ্চারণ করতে থাকেন পাল্টা শ্লোগান। একক লড়াইয়ে নিজের বুক থেকে উঠে আসে যে স্লোগানটি সেদিন তাঁকে অসুরের শক্তি যুগিয়েছিল সেটি হল - 'জয় বাংলা'। ❐

কুম্ভযাত্রা হিন্দুরাষ্ট্রের অভিসন্ধিতে ভরা পথ

সুভাষ গাটাডে

যখন মহাকুম্ভে অনুসরণ করা ভিআইপি কালচার বা মহারথী সংস্কৃতিকে এই দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে, ঠিক তখনই মুখ্যমন্ত্রী, দিনের পর দিন অভূতপূর্ব সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার ঢক্কানিনাদের পর, আত্মবিশ্লেষণের পথে না হেঁটে দুর্ঘটনার দায় ভক্তদের কাঁধেই ঠেলে দিয়েছেন। এখন হয়ত বলাই যায় যে, এই দুর্ঘটনাটি সময়ের অপেক্ষা ছিল মাত্র। কারণ নানাভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে, জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলি সহ সর্বত্র মহাকুম্ভ নিয়ে বিপুল প্রচারাভিযান চালানোর পর বিভিন্ন 'পুণ্যতিথি'তে কত মানুষের সমাগম হতে পারে এ সম্পর্কে শাসকপক্ষের ন্যুনতম ধারণাও ছিল না। তারা কী জনসমাগম সামলানো সংক্রান্ত অতীত অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নিতে পারতেন না?

Kumbh Yatra– The Adventures of Hindu Rashtra

মহা-দুর্ঘটনার মহাকুম্ভে সরকারিভাবে স্বীকৃত ৩০ জনের জীবনহানি ও অগণিত মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কি তার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সমর্থ হবেন? এটাই এই মুহূর্তে দিল্লির ক্ষমতা অলিন্দের চাপা প্রশ্ন। অবশ্য প্রশ্ন উঠছে মহাকুম্ভ ঘিরে চালানো মহাপ্রচার- 'বিশ্বের বৃহত্তম জমায়েত' আর বিপরীতে বাস্তবের প্রস্তুতিহীনতার মাঝের ফাঁক নিয়েও।

এই বিশালাকার দুর্ঘটনার জন্যে কে দায়ী?

তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রশাসনের অপদার্থতা লোকসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার পর 'বিশ্বের বৃহত্তম জমায়েতের আয়োজক' হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথের আগামী পথ এখন যথেষ্টই কঠিন।

এই বিপর্যয়কে খাটো করে দেখানোর পরিকল্পিত চেষ্টাগুলি কীভাবে কয়েকদিন ধরে চালানো হয়েছে এনিয়ে সংবাদমাধ্যমে অনেক লেখালেখি হয়েছ। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ উত্তর প্রদেশের একজন মন্ত্রী বিতর্কিত বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'এত বড়ো জনসমাগমে এ ধরনের ছোট ঘটনা ঘটেই থাকে।' এই বিবৃতির পর এতটাই হুলুস্থুল পড়ে যায় যে তাকে ক্ষমা চেয়ে আবার একটি বিবৃতি দিতে হয়। অন্যদিকে ন্যুনতম দায়িত্ববোধহীন হয়ে দুর্ঘটনার খবর বাদ দিয়ে, লাগাতার সরকারি প্রচারণাগুলি প্রকাশ করে মূলধারার সংবাদ মাধ্যমগুলি তাদের নির্লজ্জতার ভূমিকায় এক নতুন অধ্যায় জুড়েছে। জানা গেছে, পদপিষ্ট হয়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাকে সরকারিভাবে উত্তর প্রদেশ প্রশাসন স্বীকার করেছে দুর্ঘটনার ১৮ ঘণ্টা পর। এমনটাও বলা হচ্ছে, কুম্ভমেলার দুর্ঘটনায় 'পুণ্যাত্মাদের' জীবনহানির ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টুইট প্রকাশিত না হলে, মৃত্যুর ঘটনা স্বীকার করতে হয়ত যোগী ও তার প্রশাসন আরো কয়েক ঘণ্টা সময় নিত।

যে বিষয়টি ভক্তদের আঘাতে নুনের ছিটে দিয়েছে তা হল, যখন মহাকুম্ভে অনুসরণ করা ভিআইপি কালচার বা মহারথী সংস্কৃতিকে এই দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে, ঠিক তখনই মুখ্যমন্ত্রী, দিনের পর দিন অভূতপূর্ব সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার ঢক্কানিনাদের পর, আত্মবিশ্লেষণের পথে না হেঁটে দুর্ঘটনার দায় ভক্তদের কাঁধেই ঠেলে দিয়েছেন। এখন হয়ত বলাই যায় যে, এই দুর্ঘটনাটি সময়ের অপেক্ষা ছিল মাত্র। কারণ নানাভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে, জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলি সহ সর্বত্র মহাকুম্ভ নিয়ে বিপুল প্রচারাভিযান চালানোর পর বিভিন্ন 'পুণ্যতিথি'তে কত মানুষের সমাগম হতে পারে এ সম্পর্কে শাসকপক্ষের ন্যুনতম ধারণাও ছিল না। তারা কী জনসমাগম সামলানো সংক্রান্ত অতীত অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নিতে পারতেন না?

ছ'মাসও হয়নি হাথরাস জেলায় এক স্বঘোষিত বাবার সৎসঙ্গে ৬০,০০০ মানুষ ধরার মত জায়গায় ২.৫ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়ে পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জন, মূলত নারী ও শিশুর মৃত্যু ও শতশত মানুষের আহত হওয়ার ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই মনুষ্য-সৃষ্ট বিপর্যয় যোগী প্রশাসনের ঘুম ভাঙানোর জন্যে যথেষ্ট ছিল কারণ সেই সময়ে তারা মহাকুম্ভের প্রচার শুরু করে দিয়েছিল।

স্পষ্টতই বোঝা যায় তারা সচেতন ছিলনা। কী করে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা নিয়ে নিশ্চিত করে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। একটি বিস্তারিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত প্রক্রিয়া ছাড়া তা স্পষ্ট হওয়াও অসম্ভব। তবে নিশ্চিতভাবেই, যে নির্লজ্জতায় এই দুর্ঘটনাকে খাটো

করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এবং যেভাবে অপদার্থ যোগী প্রশাসনকে মহারথীদের আনাগোনা বন্ধ করতে বাধ্য করা হল, সর্বোপরি এই ৩০ জানুয়ারির সংখ্যায় দৈনিক ভাস্কর-এর মত অগ্রণী হিন্দি সংবাদ মাধ্যমে এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী সরকারি কর্তাদের নাম অবধি বলে দেওয়া হল, তার থেকে যথেষ্টই অনুমান করা যায় যে এই মৃত্যুর জন্যে কারা দায়ী। মহারথী সংস্কৃতির পোষকতা, ভক্তদের উপেক্ষা? দুর্ঘটনার পর বন্ধ হওয়া মহারথীদের আনাগোনার কথাই ধরা যাক। মহারথীরা যাতে সঙ্গম অবধি নিজেদের যানে পৌঁছে যেতে পারে তার জন্যে আলাদা রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল যা ভক্তদের চরম ভোগান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। ওই পথে সমস্ত যানবাহন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে তাদেরকে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে। এ নিয়ে লাগাতার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাপনা বিরামহীনভাবে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্বলিখিত পুরাণকথায় বিশ্বাস করে যে সরকার নিজেকে বিশ্বগুরু ধরে নিয়ে অভ্রান্ত ভাবতে শুরু করেছে এটা তাদের চরম সংবেদনহীনতার দৃষ্টান্ত। মহারথীদের যাতায়াতের অবারিত ব্যবস্থা করে দেওয়ার বোধগম্য কারণ বোধহয়, এর ফলে এই সমাগমের 'মুখ্য আয়োজক', তার মন্ত্রীসভার সদস্য, স্বজনবন্ধু ও তাদের অঙ্কশায়িত সংবাদ মাধ্যম সুযোগ করে দিয়েছে যাতে, নির্বিঘ্নে এগুলির ছবি তুলে, জনসমাগমের 'অব্যর্থ ব্যবস্থাপনা'র তেল চকচকে গল্পগাথা ছড়ানো যায়। ভক্তদের জন্যে 'অভূতপূর্ব' সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার ঢাক পেটানো সত্ত্বেও এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে প্রশাসন কুম্ভমেলার আগেকার দুর্ঘটনাগুলি থেকেও শিক্ষা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন অনুভব করে নি। নিকট অতীতে ২০১৩ সালের কুম্ভের সময়ে প্রয়াগরাজ রেলস্টেশনের দুর্ঘটনা থেকেও নয়।

গরিমা সিং-এর পরিচালনায় মহাকুম্ভে পদপিষ্টতার দুর্ঘটনা নিয়ে নিউজ ২৪ চ্যানেলের একটি আলোচনায় পদকপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতি নারায়ণ রাই যিনি ১৯৮০-র দশকের কুম্ভমেলার সময়পর্বে এলাহাবাদের ডিআইজি ছিলেন, তিনি বলেন, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তেওয়ারি (তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী, শেষবার ছিলেন ১৯৮৮-৮৯ পর্বে) কুম্ভমেলার এলাকায় মহারথীদের চলাফেরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি এমনকী তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের বলেছিলেন, নিরাপত্তা বেষ্টনীর কথা ভুলে পায়ে হেঁটে সঙ্গমে স্নান করার জন্যে। প্রসঙ্গত যোগ করা যায়, সে সময়ের টাইমস অব ইন্ডিয়ার বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও ট্রাফিক ইন দ্য এরা অব ক্লাইমেট চেঞ্জ, ওয়াকিং, সাইক্লিং, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নিড প্রায়োরিটি বইয়ের লেখক বিদ্যাধর দাতে তাঁর ফেসবুক পেজে লিখেছেন কীভাবে 'অতীতে কুম্ভমেলা অনেক উন্নতভাবে সংগঠিত হত। এতটাই উন্নত ছিল যে মুম্বাই ও হার্ভার্ড-কেন্দ্রিক স্থপতি ও অধ্যাপক রাহুল মেহরোত্রা ২০১৩ সালের শেষ এলাহাবাদ মেলা নিয়ে সুবিস্তৃত গবেষণা করে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। বইটি যুগ্ম-সম্পাদনা করেছিলেন রাহুল মেহরোত্রা ও ফেলিপ ভেরা।

কুম্ভমেলা ম্যাপিং দ্য এফিমারেল সিটি নামের বইটিতে সাউথ এশিয়া ইনস্টিট্যুটের সমর্থনে নিয়ে প্রায় পঞ্চাশের অধিক হার্ভার্ডের অধ্যাপক, ছাত্র, প্রশাসনিক কর্মী ও চিকিৎসকের ২০১৩ সালে এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় অবস্থান করে বিপুল জনসমাগমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সমীক্ষা রয়েছে'।

'স্ব-বিপণন' লজ্জা শরমের কেউ ধার ধারে?

শাসক পক্ষের যদি ভক্তদের ভোগান্তি নিয়ে ন্যূনতম সংবেদনশীলতা থাকত কিংবা এ নিয়ে কোনো পূর্বানুমানের কথা ভাবা থাকত, তবে কোনো অবস্থাতেই মহারথীদের আসা-যাওয়ার বিষয়টি রাখা হত না। এমনটা করা হলে বহু নিরীহ ভক্তের প্রাণ বাঁচতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দুর্ঘটনা ঘটার আগেই সাংবাদিক ও বিশ্লেষকরা বারবার দেখিয়েছেন, কীভাবে এই ভক্ত সমাগমকে স্ব-বিপণনের একটি উপলক্ষ্য করে ফেলা হয়েছে। কীভাবে ভক্তদের ভোগান্তি গৌণ হয়ে গেছে এবং কীভাবে মহাকুম্ভকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরসূরী হিসেবে আদিত্যনাথের স্ব-বিপণনের আখ্যানে'। এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে এই দুর্ঘটনা নিশ্চিতভাবেই 'মোদী-যোগী বেসুরো সম্পর্ক' কে আরো অবনতি দিকে নিয়ে গেছে এবং কিছুদিনের জন্যে হলেও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাতিষ্ঠনিকতায় যোগীর দ্বিতীয় নম্বরে উল্লম্ফনের ছকে প্যাঁচ খেয়ে গেছে। যোগীর ছক আপাতত ভেস্তে যদিও বা গেছে, এই মহাসমাগমের কিন্তু এটাই একমাত্র উপাখ্যান নয়। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাসনা চরিতার্থতা ব্যতিরেকে, এই মহাসমাগমকে হিন্দুত্বপন্থী আধিপত্যবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও তাত্ত্বিকরা একে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পথে একটি ধাপ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে।

ভুয়ো গল্পগাছা ছড়িয়ে ভক্তদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আরো কোণঠাসা কর, আরো দূরে ঠেলে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদী ছক থেকে শুরু করে সাধু সন্তদের সমাবেশ ঘটিয়ে (ইতিমধ্যেই তাদের প্রভূত অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে) তাদের উচ্চকিত ভাষণকে ব্যবহার করার মাধ্যমে 'হিন্দুরা প্রথমে'র দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাভাবিক গ্রাহ্যতায় আনার জন্যে যা যা করা দরকার সবকিছুই তারা করেছে।

আইনী পথেই কি মুসলিমদের কোণঠাসা করা হবে?

কয়েকমাস আগে কাঁওয়ার যাত্রার প্রাক্কালে (জুলাই ২০২৪) মুজফফরনগর প্রশাসন এক নির্দেশিকা প্রকাশ করে বলেছিল যে যাত্রা পথের সকল দোকানীকে তাদের দোকানের সামনে মালিক ও কর্মচারীদের নাম টাঙিয়ে রাখতে হবে। এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যেই নয়, যারা একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্ন দেখে সেই সমস্ত ব্যক্তি সংগঠনের মধ্যেও আতঙ্কের জন্ম দেয়। প্রতিবাদের জেরে সেই নির্দেশনামাটি 'পরামর্শ'-এ পরিবর্তিত হয়। পরবর্তীতে যোগী সরকার নিজেই একই ধরনের নির্দেশনামা জারি করে যা উত্তরাখণ্ড ও মধ্যপ্রদেশ সরকারও (উভয়ই

বিজেপি পরিচালিত) অনুসরণ করেছে। ভারতের উচ্চতম আদালত অন্তর্বর্তী আদেশে বিভিন্ন সরকারের জারি করা এই নির্দেশগুলি স্থগিত রেখেছে। পরে দেখা গেল আনুষ্ঠানিক নির্দেশনামা না থাকলেও বিভিন্ন জায়গায় দোকানীরা 'স্বযাচিত হয়ে' নামফলক টাঙিয়ে রেখেছে। যদিও কোনো প্রমাণ নেই হুমকির মুখে মুসলিমদের কোণঠাসা করে হিন্দুত্বের কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা।

মহাকুম্ভ এই অপশক্তিগুলিকে সুযোগ করে দিয়েছে মুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর আক্রমণ আরো তীব্রতর করে' বিশ্বের বৃহত্তম জনসমাগম'-এর দৃশ্যমানতার বাইরে ছুঁড়ে ফেলার। কুম্ভমেলা শুরু হওয়ার আগেই নানা অজুহাত তুলে এই মহাসমাগমে মুসলিমদের নিষিদ্ধ করার আলোচনাগুলি মনে পড়বে। এই কথাগুলি যে শূন্যগর্ভ ছিল না সেটা বোঝা গেল কুম্ভমেলা শুরু হতেই। এই মেলার শতাধী প্রাচীন সমন্বয়ের ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করে দেওয়া হল এদের অপতৎপরতায়। মধ্য জানুয়ারিতে যখন উৎসবের দিন এগিয়ে আসছে তখন অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ নামের ১৩টি আখড়া সংগঠনের পরিচালকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নেয় যে, মেলায় 'অ-সনাতনী জনগণ' অর্থাৎ যারা বিশুদ্ধ অর্থে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত নয় তারা দোকান দিতে পারবে না বা তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ঘটনা আরো গড়ানোর পর দেখা গেল এই পৃথকীকরণের আরো বিপজ্জনক কর্মসূচিও তাদের পরিকল্পনায় রয়েছে।

পদপিষ্টতার দুর্ঘটনার দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মৌনী অমাবস্যার আগের দিন বিভিন্ন আখড়ার সাধু সন্তদের নিয়ে 'সনাতন ধর্ম সংসদে'-র আয়োজন করা হয়েছিল মহাকুম্ভে। এই সভায় দেশের বিদ্যমান নানা ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেওয়ার ভয়ঙ্কর সমস্ত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে ছিল অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে সনাতন হিন্দু বোর্ড গঠন করে দেশের সমস্ত মন্দির সরকারের হাত থেকে সাধু সন্তদের হাতে তুলে দিয়ে রাম মন্দিরের ধারায় কৃষ্ণ জন্মভূমি বিতর্কের নিষ্পত্তি করা।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হল আখড়া পরিষদ এই সভায় যোগ দেয় নি কারণ তারা সনাতন বোর্ড গঠনের বিরোধী। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উৎসাহ প্রদর্শনের দৌলতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মন্দিরগুলিকে মুক্ত করার আলোচনা ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে। অতীতে সাধু সন্তরা নিজেদের গোষ্ঠী তৈরি করে কী ভাবে মন্দির পরিচালনার নামে অর্থ আত্মসাৎ করত সেই বিষয়গুলি এই পশ্চাৎমুখী আলোচনায় স্থান পায়নি। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী এই গোষ্ঠীগুলি মন্দির সমূহের তহবিল জনস্বার্থে ব্যবহার করার লক্ষ্যে নেওয়া সমস্ত উদ্যোগের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। স্বাধীনতার পর সমাজ সংস্কারকদের পক্ষ থেকে মন্দিরগুলিকে ব্যক্তিসমূহের কুক্ষি থেকে 'মুক্ত' করে আনার সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

হিন্দুরাষ্ট্র অভিমুখী সংবিধান দেশদ্রোহিতা নয়?

সম্ভবত যেদিন সনাতন বোর্ড গঠনের আহ্বান জানানো হয় সেদিনই খবর বেরোয় যে প্রস্তাবিত 'অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র'-এর সংবিধানও চূড়ান্ত করা হয়ে গেছে যা মহাকুম্ভে ২ ফেব্রুয়ারি বসন্ত পঞ্চমীর দিন প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করা হবে। ২৫জন গবেষকদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতি রামায়ণের অনুপ্রেরণা, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা, মনুস্মৃতি ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করে ৫০১ পৃষ্ঠার এই নথি প্রস্তুত করেছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও নতুন দিল্লির কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের নিয়ে তৈরি 'হিন্দু রাষ্ট্র সংবিধান নির্মাণ সমিতি' এই খসড়া প্রস্তুত করেছে। ভয়াবহ দিকটি হল যে এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক সাংবাদিকদের খোলাখুলি জানিয়েই দিয়েছেন যে 'তাদের লক্ষ্য হল ২০৩৩ নাগাদ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা'। স্বাধীন ভারতের জন্য এভাবে নতুন সংবিধানের প্রস্তাব করা যে এবারই প্রথম ঘটে নি তার স্বপক্ষে যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত রয়েছে। ১৯৯২ সালে বাবরী মসিজদ ধ্বংসের পরপরই ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তফাৎটা মাত্র এটাই যে সেই সাংবাদিক সম্মেলনটি তখনকার প্রধান বিরোধী দল বিজেপির এক সাংসদের বাড়িতে ডাকা হয়েছিল।

রাম মন্দির আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত স্বামী মুক্তানন্দ ও বামদেও মহারাজ (ইন্ডিয়া টুডে, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৯৩) সেই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তা ছিল। ''এই সংবিধান 'হিন্দু বিরোধী', অতএব একে পরিত্যাগ করতে হবে। এদেশের আইনে আমাদের কোনো আস্থা নেই। সাধুরা দেশের আইনের উর্ধে।''

অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারও সংবিধান বদলের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে সরকার ২০০৪-এ পরাস্ত হয়ে বিদায় নেয়। ভারতের প্রধান বিচারপতি এম, এন, ভেঙ্কচালাইয়ার নেতৃত্বে এই মর্মে একটি আয়োগও গঠন করেছিল সেই সরকার।

একটা কথা আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, এই অপতৎপরতাগুলি কিছুতেই বন্ধ হবে না কারণ হিন্দুত্বের শক্তিগুলি সর্বদাই ভারতের সংবিধান অস্বস্তিবোধ করে। এখন অবধি, তাদের লক্ষ্যপথে সবচেয়ে বড় বাধা সংবিধান। ফলে একটি ত্রিমুখী নীতিগত অবস্থান অপেক্ষমান আমাদের জন্যে। এক, সংবিধানকে রক্ষা করা। দুই, এই আধিপত্যবাদীদের স্বরূপ উন্মোচন করা। তিন, সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সরলমনা সাধারণ মানুষকে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির খপ্পর থেকে বের করে আনা। ❐

(ঋণ কাশ্মীর টাইমস, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ভাষান্তর শুভ প্রসাদ নন্দী মজুমদার মার্কসবাদী পথের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

কেজরিওয়ালের দিল্লি-পরাজয় প্রায় অনিবার্যই ছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিল্লি বিধানসভা ভোটে ২৭ বছর পর বিজেপি কীভাবে জিতল। কেনই বা জিতল। আম আদমি পার্টি (আপ)-র এমন গোহারা অবস্থা হল কেন? তা নিয়ে নানা তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক

বিশ্লেষণ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সহজ পাটিগণিত হলছে, কংগ্রেস এবং আপ জোট বেঁধে লড়লে অন্তত ৩৬টি আসন জিতে তারাই সরকার গড়তে পারত। বিজেপির স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। লোকসভা ভোটে দিল্লিতে বিজেপিকে হারাতে যে জোট কংগ্রেস ও আপ করেছিল তা ব্যর্থ হয়। তারপরেই তড়িঘড়ি তা ভেঙে না দিয়ে পারস্পরিক অভিযোগ, মনোমালিন্য ও বিবাদ সরিয়ে সম্মানের সঙ্গে সেই জোট ধরে রাখলে বিধানসভা ভোটের ফল বদলে যেতে পারত। ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, ৭০টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে বিজেপির জয়ের ব্যবধান থেকে আম আদমি ও কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বেশি। অর্থাৎ সহজ কথায়, কংগ্রেস ও আপ যৌথভাবেবিজেপি প্রার্থীর তুলনায় ওই ১৪ কেন্দ্রে বেশি ভোট পেয়েছে। কেন্দ্রগুলো হলো নিউদিল্লি, জংপুরা, গ্রেটার কৈলাস, মালবিয়ানগর, রাজেন্দ্রনগর, টিমারপুর, বাদলি, নাংলোই জাট, মাদিপুর, মেহরৌলি, ছত্তরপুর, সঙ্গমবিহার, ত্রিলোকপুরী ও কস্তুরবানগর। নিউদিল্লি কেন্দ্রে ইন্দ্রপতন ঘটেছে আম আদমি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল হেরে যাওয়ায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী করেছিল দিল্লির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী সাহেব সিং ভার্মার পুত্র প্রভেশকে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রভেশের বিরুদ্ধে বহু সময় লোক খ্যাপানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘৃণাভাষণের দায় চেপেছে। ওই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী করেছিল তাদের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শীলা দীক্ষিতের পুত্র সন্দীপকে, যিনি রাজ্য রাজনীতিতে প্রবলভাবে কেজরিওয়ালবিরোধী বলে পরিচিত এবং লোকসভা ভোটে জোটের বিরোধিতায় সরব ছিলেন। ভোটের ফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে, কেজরিওয়াল হেরেছেন ৪ হাজার ৯৯ ভোটে, অথচ সন্দীপ পেয়েছেন ৪ হাজার ৫০৪ ভোট। সহজ হিসাব হল, ওই ভোট কেজরিওয়াল পেলে জিতে যেতেন ৪০৫ ভোটে। একই ছবি জংপুরাতেও। সেখানে হেরেছেন আপের সাবেক উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। বিজেপির তারবিন্দর সিং মারোয়ার কাছে তিনি হেরেছেন মাত্র ৬৭৫ ভোটে। অথচ ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের ফরহাদ সুরি পেয়েছেন ৭ হাজার ৩৫০ ভোট। দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাসে হেরেছেন আপের মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ। তাঁকে হারিয়েছেন বিজেপির কাউন্সিলর শিখা রায়। শিখা জিতেছেন ৩ হাজার ১৮৮ ভোটে, অথচ কংগ্রেস প্রার্থী গরবিত সিংভি পেয়েছেন ৬ হাজার ৭১১ ভোট। মালভিয়ানগরেও একই ছবি। সেখানে হেরেছেন কেজরিওয়ালের আর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী সোমনাথ ভারতী। বিজেপির প্রার্থীর কাছে তিনি হেরেছেন মাত্র ২ হাজার ১৩১ ভোটে। অথচ ওই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী জিতেন্দ্র কুমার কোচার পেয়েছেন ৬ হাজার ৭৭০ ভোট। আপ নেতৃত্ব ও বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার রাখি বিড়লা দাঁড়িয়েছিলেন মঙ্গলাপুরী কেন্দ্রে। সেখান থেকে পরপর তিনবারের এমএলএ তিনি। বিজেপির কৈলাস গাঙ্গোয়ালের কাছে তিনি ১০ হাজার ৮৯৯ ভোটে হেরে যান। ওই কেন্দ্র তৃতীয় হন কংগ্রেসের জে পি পানোয়ার। তিনি পেয়েছেন ১৭ হাজার ৯৫৮ ভোট। রাজেন্দ্রনগরে আপ প্রার্থী ছিলেন দুর্গেশ পাঠক। বিজেপির উমঙ্গ বাজাজের কাছে তিনি হেরেছেন মাত্র ১ হাজার ২৩১ ভোটে। কংগ্রেসের বিনীত যাদব ওই কেন্দ্রে পেয়েছেন ৪ হাজার ১৫ ভোট। সঙ্গমবিহারে আম আদমির বিধায়ক দীনেশ মোহানিয়া বিজেপির চন্দন চৌধুরীর কাছে হেরেছেন ৩৪৪ ভোটে। সেখানে কংগ্রেসের হরিশ চৌধুরী পেয়েছেন ১৫ হাজার ৮৬৩ ভোট। এই একই ছবি বাদলি, ছত্তরপুর, মেহরৌলি, নাংলোই জাট, টিমারপুর ও ত্রিলোকপুরীতে। কস্তুরবানগর কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী দ্বিতীয় হয়েছেন ১১ হাজার ৪৮ ভোটের ব্যবধানে। আপের ভোট পেলে কংগ্রেস ওই আসনে জিততেও পারত। গত আড়াই থেকে তিন বছর উন্নয়ন ও প্রশাসনের দিকে নজর না দিয়ে আপ ক্রমাগত বিবাদ করে গেছে উপরাজ্যপালের সঙ্গে। ইতিমধ্যে দুর্নীতির কালি লেগেছে আপের ভাবমূর্তিতে। আবগারি কেলেংকারির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'শিসমহল'।

সৎ ও স্বচ্ছ রাজনীতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা কেজরিওয়াল ও তাঁর দল তত দিনে আর পাঁচটা দলের রূপ ধারণ করেছে। মাত্রা ছাড়া বায়ুদূষণ, পানীয় জলের অভাব, জঞ্জাল সমস্যা ও যমুনা নদীর দূষণের কারণে সাধারণ মানুষের বিরক্তি ঝরেছে এই সময়ে। আপ নেতৃত্বকে সবদিক দিয়ে ব্যতিব্যস্ত রেখে সেই সুযোগে বিজেপি তার সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তার করেছে দিল্লিতে। আপের দুর্গ বলে পরিচিত ঝুগ্গি,ঝোপড়ি এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহলে আপেরই মতো দানখয়রাতের প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে আরএসএস লোকসভা ভোটে বিজেপির দিকে সহায়তার হাত সেভাবে বাড়ায়নি, মান অভিমান পর্ব শেষে সেই আরএসএসকে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবার সক্রিয় করে তুলেছে। এসবের মধ্যে সোনায় সোহাগা হয়েছে আপ ও কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান রেষারেষি। লড়াইটা তীব্রভাবে ত্রিমুখী হয়ে ওঠায় বিজেপির হয়েছে সুবিধে।

স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতির কথা বলে আন্না হজারের লোকপাল আন্দোলনের সঙ্গী কেজরী ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু আবগারি মামলায় গ্রেফতারির পরে তা ফিকে হয়েছে। 'জেল কা জবাব ভোট সে' স্লোগান ভোটারদের মনে দাগ কাটতে পারেনি। বরং জেলে বসে সরকার চালানো নিয়ে সমালোচনা হয়েছে বিস্তর। শেষ পর্যন্ত ভোটের পাঁচ মাস আগে ইস্তফা দিয়ে আতিশী মার্লেনার হাতে মুখ্যমন্ত্রিত্ব তুলে দিতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিপুল সরকারি খরচে কেজরীর 'শিসমহল নির্মাণ' নিয়ে মোদীর পাশাপাশি 'ইন্ডিয়া'র শরিক কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীও কটাক্ষ করেছিলেন। গোটাটাই 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলে কেজরী দাবি করলেও দিল্লিবাসী ভরসা রাখেননি তাঁর সেই সাফাইয়ের উপর। দিল্লির বিভিন্ন বস্তিতে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক 'পূর্বাঞ্চলী' (বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা) ভোটাররা গত এক দশক ধরে আপকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এ বার মোদীর মুখে প্রতিটি সভায় পূর্বাঞ্চলীদের স্বার্থরক্ষার অঙ্গীকার পরিস্থিতি বদলে দিয়েছিল। এমনকি, শাহের মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে বস্তিবাসীদের উপর জুলুমবাজির অভিযোগেও সাড়া মেলেনি।

অষ্টম বেতন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করছাড়ের ঘোষণা যে শেষ প্রহরে মোদীর দলের পালে হাওয়া জুগিয়েছে, ভোটের ফলাফলে তা স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের কয়েক লক্ষ কর্মচারী (যাঁরা দিল্লিতে পরিচিত 'বাবু' বলে) দিল্লির ভোটার। রয়েছেন বহু সেনাকর্মীও। মনে করা হচ্ছে, তাঁদের ভোট একচেটিয়া ভাবে পেয়েছে বিজেপি। অতীতে প্রধানমন্ত্রী মোদী 'রেউড়ি' বলে খয়রাতির রাজনীতির বিরোধিতা করলেও দিল্লি দখলের দৌড়ে আপ এবং কংগ্রেসের মতোই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীর ভান্ডারের ধাঁচে মহিলাদের হাতে নগদ তুলে দেওয়ার মতো জনমোহিনী ঘোষণা করেছিল পদ্মশিবির।

এর পাশাপাশি, বিধানসভা ভোটের জোড়া 'সঙ্কল্পপত্রে' (নির্বাচনী ইস্তাহার) ঝুপড়িবাসীদের হাতে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেওয়া, সরকারি স্কুলে কেজি (কিন্ডার গার্টেন) থেকে পিজি (পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন) পর্যন্ত নিখরচায় গরিব পড়ুয়াদের পড়ার ব্যবস্থা, পিছিয়ে-থাকা সমাজের পড়ুয়াদের মাসিক হাজার টাকার বৃত্তি, চাকরির পরীক্ষার্থীদের ১৫ হাজার টাকা এককালীন সাহায্য, অটোচালকদের জন্য বিনামূল্যে বিমার প্রতিশ্রুতি এ বার বিজেপির জয়ের অন্যতম 'অনুঘটক' হয়েছে।

পাশাপাশি, অমিত শাহের 'বুথ লেভেল ম্যানেজমেন্ট' কৌশল সংগঠিত ভাবে ইভিএম পর্যন্ত টেনে এনেছে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভোটকে। না ফেলে উপায়ও ছিল না। ১৪ আসন জিতে গেলে ৩৬টি আসন পেয়ে আপ, কংগ্রেসের 'ইন্ডিয়া' জোটই দিল্লিতে ক্ষমতায় আসত। প্রাপ্ত ভোটের হিসাবেও বিজেপি পড়ত অনেক পিছিয়ে। ৭ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে বিজেপি এবার পেয়েছে ৪৫ দশমিক ৮ শতাংশ। সেখানে আপের ভোট ১০ শতাংশ কমে হয়েছে ৪৩ দশমিক ৮। মজার বিষয় এ,ই, জোট থাকলে আপের সঙ্গে কংগ্রেসের সাড়ে ৬ শতাংশ ভোট যোগ হতো। বিজেপির চেয়ে 'ইন্ডিয়া' তাহলে এগিয়ে থাকত ৫ শতাংশ ভোটে। দিল্লিও অধরা থাকত বিজেপির কাছে। হারের হ্যাটট্রিক এড়াতে পারতেন না নরেন্দ্র মোদি।

চার মাস আগে হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের আশায় জল ঢেলে দিয়েছিলেন আম আদমি পার্টি (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়াল। বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে নিশ্চিত করেছিলেন সে রাজ্যে টানা তিন বার বিজেপির ক্ষমতায় আসা। এ বার দিল্লিতে আপের 'হ্যাটট্রিক' রুখে তার প্রতিশোধ নিল কংগ্রেস। আর সেই সঙ্গে চাপে পড়ে গেল দিল্লির পড়শি রাজ্য পঞ্জাবের আপ সরকারও।

এই আবহে দিল্লির হারের জেরে 'ইন্ডিয়া'য় তৃণমবল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী কেজরীওয়ালের প্রভাব কমবে বলে মনে করছেন অনেকেই। সে ক্ষেত্রে বিজেপি বিরোধী রাজনীতির সেই শূন্যস্থান পূরণে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে ঝাঁপাবেন নিশ্চয়ই। ❐

ঢাকি সমেত বিসর্জন, বিপজ্জনক ভাবনা

মজিবুর রহমান

অসিকুল, আশিস, শরিফ, সম্রাট, স্বর্ণেন্দ্যু, মোতিয়ার, মৃত্যুঞ্জয়, রাসবিহারী, প্রসেনজিৎ, রাজু, রাজীব, শাকিল, সুপর্ণা, মৌমিতা- এঁরা সবাই ২০১৬ সালের প্যানেল থেকে নিযুক্ত সহকারী শিক্ষক বা শিক্ষিকা। আমার সুপ্রিয় সহকর্মী। পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে একসাথে কাজ করছি। বর্তমানে বিদ্যালয়ের টিচিং স্ট্রেন্থ-এর অর্ধেক এঁদের দিয়েই গঠিত। এঁরা নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রিক ও শিক্ষা-বহির্ভূত কাজের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এখন এঁদের কেউ বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কমিটির সম্পাদক। কেউ ই সি সি এস বা সমবায় সমিতির সম্পাদক। কেউ কন্যাশ্রীর নোডাল টিচার। কেউ কম্পিউটার চালান। কেউ আয়রন ট্যাবলেটের হিসাব রাখেন। হ্যাঁ, এঁদের কাউকেই কখনও আমার 'দুর্নীতিমূলক' নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিযুক্ত 'অযোগ্য' শিক্ষক মনে হয়নি। এঁরা কেউ কোনো দুষ্টচক্রের সাথে যুক্ত আছেন বলেও আমার কখনও মনে হয়নি। এঁদের কারোর আচরণে সন্দেহজনক কিছু কখনও দেখিনি। যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে স্কুলের অগ্রগমনে এঁরা অবদান রাখছেন। তাহলে এঁদের চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে কেন? এঁরা সবাই চলে গেলে স্কুল চলবে কিভাবে? এঁরা সবাই দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। মেধাবী ও পরিশ্রমী। প্রথাবদ্ধ পড়াশোনা শেষ করেই একটি চাকরির জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছেন এবং সফল হয়েছেন। আরও বড় স্বপ্ন দেখার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। স্কুলে ঢোকার সময় প্রায় সকলেই ছিলেন অবিবাহিত। এখন মোটামুটি সবাই বিবাহিত। কারোর কারোর সন্তান হয়েছে। পরিবারকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন। খরচ সামলাতে ব্যাঙ্ক অথবা পি এফ থেকে ঋণ নিয়েছেন। পরিবারের আর্থিক বোঝা বহন করছেন। বেতন থেকেই সব সামাল দিচ্ছেন। যদি চাকরিটা চলে যায়, বেতন বন্ধ হয়ে যায়, প্রায় প্রত্যেকটি পরিবার পথে বসবে! একটা ভয়ঙ্কর অমানবিক অবস্থা সৃষ্টি হবে।

'দুর্নীতিমূলক' নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১৬ সালের প্যানেল থেকে বড়জোর ২০ শতাংশ অযোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছেন। বাকি ৮০ শতাংশ ব্যক্তিই দুর্নীতির বেড়াজাল ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন। যাঁরা চরম দুর্নীতি সত্ত্বেও নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পেরেছেন তাঁদের তো কুর্ণিশ জানানো উচিৎ! যে ২০ শতাংশ বাঁকা পথে বা পেছনের দরজা দিয়ে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা নিশ্চিতভাবেই অন্যায় ও বেআইনি কাজ করেছেন। তদন্তকারী সংস্থা তাঁদের চিহ্নিত করেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করেছে। আলোচ্য প্যানেলের ২৬ হাজার প্রার্থীর মধ্যে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছয়-সাত হাজারের বেশি নয়। তাঁরা

অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন বলেই কিছু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন এবং তেরশো দিন ধরে কলকাতায় বিক্ষোভ অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। অযোগ্য শিক্ষক বিদায় নেবেন এবং তাঁদের স্থানে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়েছেন এমন প্রার্থীরা নিযুক্ত হবেন-- এটাই প্রত্যাশিত। অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের বিতাড়িত করে বঞ্চিতদের নিয়োগ করা হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

যাঁরা রাজ্য সরকারের কাঁধে দোষ চাপিয়ে পুরো প্যানেল বাতিল করার পক্ষে সওয়াল করছেন তাঁরা সরকারের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পরিকল্পনাকেই সার্থক করতে সহায়তা করছেন। বৈধ-অবৈধ, যোগ্য-অযোগ্য সবার একই পরিণতি কখনওই কাম্য হতে পারে না। অবৈধ ও অযোগ্যদের সরিয়ে দেওয়া যেমন জরুরি তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বৈধ ও যোগ্যরা যাতে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে কাজ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা। ঢাকি সমেত বিসর্জন অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবনা। ❐ (লেখক মুর্শিদাবাদের কাবিলপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।)

পুরনো লেখা ফিরে দেখা

বাংলা উপন্যাসের ধারায় গৌরকিশোর ঘোষ

সত্যপ্রিয় ঘোষ

২

গৌর কিশোর ঘোষের প্রথম উপন্যাস ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের মে মাসে। এই কাজটি যে তাঁর লেখালেখির জীবনের সূচনা করেছিল তা নয়। একজন যেমন সকালে বাতি তৈরি করে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর জন্য প্রস্তুত করেন, তেমনি তিনি ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবেদন লিখে নিজেকে প্রস্তুত করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই হল ‘এ কলকাতা’ (১৯৫০)। এত দিক থেকে তা বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন ধারার অনুসারী।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে, বাংলা উপন্যাসের জন্মের আগে উপস্থাপিত হাস্যরসাত্মক ওব্যঙ্গাত্মক কাজ পাওয়া যায়, যেমন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নববাবুবিলাস’ (১৮২৫) এবং প্যারিচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরে দুলাল’ (১৮৫৮) বা কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোমপেঁচার নকশা’ (১৮৬২) ইত্যাদি উপন্যাস না-হওয়া সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়। একইভাবে ‘রূপদর্শী’ ছদ্মনামে ‘নকশা’র আকারে লেখা গৌরকিশোর ঘোষের অন্যান্য রচনাগুলোকেও স্বীকার করতে হবে।

‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ উপন্যাসের পটভূমি পূর্ব বাংলার যশোর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) একটি গ্রাম। বিংশ শতাধীর বিশের দশকে যখন দেশকে বিদেশী শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে কংগ্রেস লিপ্ত ছিল, তখন নীতি ও পথের ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যখন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বারদোলি কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজির প্রস্তাব মতো অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। তখন কলকাতায় কাউন্সিল নির্বাচনে অংশ নেওয়া না-নেওয়া অথবা ওই নির্বাচনকে ব্যর্থ করার লক্ষ্যে নির্বাচনে যাওয়া না-যাওয়া; এই তিনটি দ্বন্দ্ব ছিল চরমে। মডারেট, নো চেঞ্জার এবং স্বরাজ্য দলের মধ্যে কোন্দলের কারণে সারা দেশে যে অশান্তি তৈরি হয়েছিল তা বাংলার একটি ছোট গ্রামে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল; সে সবই রয়েছে এই উপন্যাসে। যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করা হিন্দু-মুসলমান রাষ্ট্রের বিভেদ নীতির ফলে কীভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, কীভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থের টানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম ছড়িয়ে পড়লো, কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের সাম্প্রদায়িক বিভাজনে সম্মতিদান এবং কাউন্সিলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য দেশবন্ধুর সাম্প্রদায়িক নীতি কীভাবে কাউন্সিলে মুসলমানের আসন সংরক্ষণে একধরনের সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছিল এবং বাংলার গ্রামেও তার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল; এই সমস্ত কিছু অনুসন্ধানের অনন্য বিবরণই এই উপন্যাসের বিষয়।

বদ্ধমূল কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, হিন্দুত্বের মতো অন্তহীন সংস্কারে বিশ্বাসী হিন্দুরা মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বলে দূরে ঠেলে রাখা, মুসলমানদের হিন্দু-বিদ্বেষের স্বরূপ এবং তার পরিণতি ইত্যাদি এই উপন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে এই উপন্যাস। তবে এটি কোনো রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। যদিও শেষ হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তার মরদেহ দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আনা হয় দার্জিলিং মেইলে করে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৫ সালের জুনে। ইতিহাসের পটভূমি ব্যবহার করা হয়েছে তৎকালীন বাংলার সমাজ-মানসিকতার আভাস দিতে। যদিও একভাবে এটি ঐতিহাসিকও বটে কারণ লেখক এতে আলোচিত সমাজ, সময়কাল ও চরিত্রগুলো নিজের চোখে দেখেননি। লেখক ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উপন্যাসে বর্ণিত সময়সীমা ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত। ফলে উপন্যাসের বিষয় জানতে তাঁকে ঐতিহাসিক তথ্য জানার মতো করে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এর সত্য ও মিথ্যাকে যাচাই করে তিনি সেই অতীতকে চিরন্তন সত্যের রূপ দিয়েছেন। এই সত্যকে জানার জন্য সময়ের বাধা অস্বচ্ছ বা দুর্ভেদ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, সময়ের ব্যত্যয় একটি নির্দিষ্ট দেশ ও কালের বাস্তবতার স্বরূপ জানতে যে সহায়ক তা প্রমাণিত। একটি বড় তৈলচিত্রের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার জন্য যেমন দূরত্ব প্রয়োজন।

এই উপন্যাসের বিন্যাস হিসেবে যে সময়কে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাতে বাঙালি সমাজের মানসিকতায় যেপরিবর্তনগুলো ঘটেছে, লেখক তার সুস্পষ্ট রূপ দিতে সফল হয়েছেন। আধুনিক জীবন সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে গ্রামীণ জীবনের শেকড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে যৌথ পরিবার। নাগরিক সম্মান পেতে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে। ভারতে দেড়শো বছরের বিদেশী শাসন এতটাই গভীরে পৌঁছেছিল যে তার বন্ধন ছিন্ন করার সমস্ত

প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। তখন স্বপ্ন দেখার সুযোগ ছিল না, প্রয়োজন ছিল প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা যাতে স্বাধীনতার ভিত তৈরি করা যায়; এই বাস্তবতাই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মেজো বাবু, ঝিনাইদহ নামের একটি গ্রামের অভিজাত পরিবারের মধ্য সন্তান; একজন আদর্শবাদী ও যুক্তিবাদী মানুষ। বিএ পাশ করার পর তিনি কলকাতা ছেড়ে গ্রামে আসেন এবং কৃষক ও দরিদ্রদের জন্য একটি স্কুল তৈরি করেন, পরে সেটি একটি সান্ধ্য বিদ্যালয় হয়।

জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি সনাতন মূল্যবোধ ভাঙার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন, কিন্তু সবকিছু ব্যর্থ হতে দেখে তিনি গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যান। সেখানে একটি চটকলের অফিসে কাজ নেন। যৌবনে তিনি আবার শহরে চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসেন। একটি এমই স্কুল খোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু সরকারের বিরোধিতার কারণে সেই স্কুল সরকারি অনুমোদন পায়নি। পরিবর্তে, একটি মুসলিম মিডল মাদ্রাসার অনুমোদন দেওয়া হয়; সেটা করা হয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উস্কে দিতে। গ্রামীণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ওই যৌথ পরিবারের সদস্যরা তখন নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এই মহাগ্রন্থ 'দেশ মাটির মানুষ'-এর প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'প্রেম নেই'। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে চলেছে। এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার যা গ্রামীণ মানুষের জীবন পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে ব্যবহার করা হয়েছে; ভাষায় এর অনুবাদ করা কঠিন। লেখক পূর্ব বাংলার যশোর জেলার কথ্য ভাষা এত সহজ ভাবে ব্যবহার করেছেন যে ওই ভাষার সঙ্গে পরিচিত না হলেও যেকোন বাঙালি পাঠক এর প্রতি আকৃষ্ট হবেন। গ্রামীণ প্রবাদ-প্রবচন, পুরনো প্রথা, উপবাস, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, খেতমজুর, নারী-পুরুষ; এসবের ভাব ও ভাষা, সমগ্র পরিবেশ ও ঘটনাবলী যেভাবে এই উপন্যাসে বাস্তবসম্মত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ করে।

বাস্তবতার পরীক্ষায় বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা উপন্যাস আজকাল যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, এই উপন্যাসে আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে লেখকের গভীর সংযোগের কারণে উপন্যাসটিও একই উচ্চতায় পৌঁছাতে পেরেছে। পারিবারিক ভালোবাসা, স্নেহের বন্ধন, সন্তানের গ্রহণযোগ্যতা, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ায় নবজাতকের ভূমিকা লেখক পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ছাড়াও গৌরকিশোর ঘোষের অন্যান্য উপন্যাস হল 'এই দাহ' (১৯৬২), 'মনের বাঘ' (১৯৬৩), 'লোকটা' (১৯৬৬), 'গাড়িয়াহাট ব্রিজার ওপর থেকে দুজনে' (১৯৭২), 'প্রেম নেই' (১৯৭৮), 'এক ধরনের বিপন্নতা (১৯৮১), 'কমলা কেমন আছে' (১৯৮৫)।

এর মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়, 'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাস এবং এর ধারাবাহিক 'প্রেম নেই' উপন্যাসে লেখক গ্রামীণ সমাজ ও পার্থিব জীবনের অন্তর্গত চিত্র তুলে ধরেছেন। আর 'দেশ মাটি মানুষ'-এর যে সামগ্রিক রূপ লেখক চিত্রিত করেছেন, তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে অনুপস্থিত। সেগুলিতে নাগরিক জীবনের অবক্ষয় ও খণ্ডিত নেতিবাচক দিকটিই বর্ণিত হয়েছে। 'মনের বাঘ' উপন্যাসে লালসা ও সমকামিতার প্রবণতার পেছনে আন্দ্রে জিদের ছায়া দেখা যায়। 'লোকটা' উপন্যাসের নায়ককে ফ্রানৎজ কাফকার 'জোসেফ কে' বলে মনে হয়। 'গাড়িয়াহাট ব্রিজার ওপর থেকে দুজনে' উপন্যাসে নিজেকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় কামুর অ্যাবসার্ড উপাদানের ছায়া বিদ্যমান। পাশাপাশি তাঁর লেখা উপন্যাসের মতো বড় গল্পগুলোর মধ্যে 'সাগিনা মাহাতো' অন্যতম। যেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতির অন্তঃসারশূন্যতা দেখানোর সময়েও কোনো ইতিবাচক মনোভাব দেখা যায় না। গল্পে চলচ্চিত্রের উপাদান থাকায় 'সাগিনা মাহাতো' ছবিটিও মানুষের কাছে সমাদৃত হয়। সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ভণ্ডামি আর 'সগিনা মাহাতো'র ট্র্যাজিক চরিত্র স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপরও এটা না বলে পারা যায় না যে এটা ছিল লেখকের পক্ষ থেকে একটা আবেগহীন আচরণ। 'এক ধরনের বিপন্নতা' উপন্যাসে বিকৃত কামুকতা ও পশুত্বের যে নোংরামি জমে উঠেছিল তা খণ্ডন করা হয়েছে। তার পরবর্তী উপন্যাস 'কমলা কেমন আছে'-তে দুই একাকী মানুষ একটি নবজাতক শিশুর জন্য পরিপূর্ণতা অর্জন করে। একটি শিশুকে সামাজিক বৈধতা দিতে এবং তাকে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দুই বিচ্ছিন্ন নারী- পুরুষ একে অপরের ঘনিষ্ঠতা খোঁজে।

শিশু এই লেখকের কেন্দ্রীয় বিষয়, শিশু চরিত্র গৌরকিশোর ঘোষের লেখায় খুব সহজেই ফুটে ওঠে। সে একটা নির্ভরযোগ্য জগৎ পায় এবং এই জগতে লেখকও তাঁর নিজের ঘর পান; তাঁকে বিদেশি কোনো আদর্শের ফাঁদে পা দিতে হয় না। ❐ (শেষ)

(লেখাটি 'বহুস্বর' প্রকাশিত 'প্রবন্ধ সংকলন। সত্যপ্রিয় ঘোষ' থেকে নেওয়া হয়েছে)

নাগরিক স্মৃতিচারণা

মৌলবি মুজিবর রহমান
এক বিস্মৃত সাংবাদিক

মিলন দত্ত

৩

আবুল মনসুর আহমেদের বিখ্যাত বই 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'-এ তিনি জানাচ্ছেন, 'আমরা মুসলমান কংগ্রেসীরা মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস বর্জন করিয়া নিখিল-বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করি (১৯২৯)।খ এই সময় আমি ওকালতি পাস করিয়া 'দি মুসলমানের' কাজ ছাড়িয়া ময়মনসিংহ জিলা কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করি। সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির ময়মনসিংহ শাখা গঠন করিবার কাজে হাত দেই।'

মুজিবর রহমানের চরিত্রের আর একটি দিক জানতে পারি আবুল ফজলের বই থেকে 'কোন সময়ই মুজিবর রহমানের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদাকে তিনি কখনও এতোটুকু খাটো করেনি, এমনকি নিজের আপন জনের কাছেও। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকাকালে তিনি কিছু গুড় ও পাটালি পাঠাবার কথা লিখেছিলেন ছোট ভাই রফিকুর রহমানকে। সে প্রসঙ্গে সম্ভবত তিনি লিখেছিলেন 'I do not like to put you any trouble or put you to any expences for me' এ কথার উত্তরে কিছুটা অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে রফিকুর রহমান লিখেছিলেন 'এরকম লিখিবার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না। আপনার নিকট হইতে এইরকম কথা শুনিব আশা করি নাই।' সেই চিঠিতে রফিকুর রহমান আরো লিখেছিলেন,'৫ টাকা পাঠাইলাম, আমি আপনার টাকা যেরকম ইচ্ছা খরচ করিতেছি আর এই সময় এই সামান্য টাকা চাহিতে আপনি ইতস্ততঃ বোধ করিয়াছেন দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। ইহার অন্যকোন meaning আছে কিনা বুঝিলাম না।' উদ্ধৃত কথা কয়টিতে মুজিবর রহমানের আর্থিক অসচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মসম্মানবোধেরও পরিচয় ফুটে উঠেছে;আর কনিষ্ঠের কণ্ঠে ফুটেউঠেছে অভিমানের সুর।'

আবারও মুজিবর রহমানের বিষয়ে জানতে আবুল ফজলের বইয়েই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। তিনি লিখেছেন 'মৌলবি মুজিবর রহমান কোন অর্থে গোড়া ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর অন্তরে একটা সহজাত ধর্ম ছিল। পারিবারিক ধর্মের ঐতিহ্যের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন। তাঁর বাহ্যিক চালচলনেও ঐতিহ্যের পরিচয় ফুটে উঠতো। আচকান-পাজামা আর টুপি ছাড়া তাঁকে কখনো দেখা যায়নি। বিপ্লববাদ আর বিপ্লবীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মুজিবর রহমান নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারেননি তাই তিনি ঐ পথ ছেড়ে তিনি এবার শরিক হলেনমুক্ত ও প্রকাশ্য রাজনীতিতে। 'দি মুসলমান'কে পেলেন তিনি নিজস্ব হাতিয়ার হিসেবে। তাঁর রাজনৈতিক সামাজিক ধ্যান-ধারণা আর আদর্শবাদ এবার রূপ পেতে লাগলো'মুসলমান'-এর পৃষ্ঠায়। অকৃত্রিম ধর্মবোধ, উচ্চতর আদর্শবোধ আর আন্তরিক সততার যাঁর সাংবাদিক আর রাজনৈতিক জীবনের একমাত্র মূলধন তাঁর পক্ষে বৈষয়িক সাফল্য যেমন অসম্ভব তেমনি রাজনীতি আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠাও কল্পনাতীত। কোন না কোন রকম কপটতা ছাড়া আমাদের দেশে রাজনৈতিক সাফল্য আজও আকাশ-কুসুম। তাই মুসলমানের বৈষয়িক সাফল্য যেমন হয়নি তেমনি তার সম্পাদকের জীবনে রাজনৈতিক সাফল্য দেখা দেয়নি কোনদিন।

সে যুগের অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মী ও নেতার তুলনায় মুজিবর রহমানও বিদেশী সরকারের হাতে নির্যাতন ভোগ করেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুজিবর রহমান 'England– Turkey and Indian Mussalmans'এ নামে ধারাবাহিক সম্পাদকীয় লিখে সাম্রাজ্যবাদকে করেছিলেন কঠোর আক্রমণ। ফলে'মুসলমান'-এর কাছে জামানত তলব করা হয় আর আদেশ দেওয়া হয় আগাম সরকারী অনুমোদন ছাড়া কোন সম্পাদকীয় প্রবন্ধই যেন'মুসলমান'-এ ছাপা না হয়। এনিয়ে সেদিন সংবাদপত্র মহলে তুমুল ঝড় উঠেছিল। আদর্শবাদী মুজিবর রহমান সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অন্যায় আদেশের কাছে নতি স্বীকার করেননি; কোনরকম সম্পাদকীয় ছাড়া অর্থাৎ সম্পাদকীয় কলম খালি রেখে তিনি পত্রিকা বের করতে লাগলেন। শেষে অবশ্য সরকার এ আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের সময় তিনি অকারণে গ্রেপ্তার হয়েছেন; এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, এ দণ্ডে সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল পঁচিশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ছ'মাস জেল। এতসব নির্যাতন ভোগ সত্ত্বেও মুজিবর রহমান স্রেফ 'মুসলমান'-এর সম্পাদক রয়ে গেছেন; ছোট-বড়-মাঝারি কোনরকম নেতাই হতে পারেননি। অর্থাৎ নিজের আদর্শের সঙ্গে আপোষ করে নেতা তিনি হতে চাননি। অথচ ঐ সময়ে যাঁরাতাঁর সঙ্গে ছিলেন পরবর্তী সময়ে তাঁরা প্রায় সবাই নেতা, উপ-নেতা হয়েছেন। সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে সততার যে আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন; যে আদর্শ থেকে 'মুসলমান' কোনদিন বিচ্যুত হয়নি, তেমন আদর্শের নজির সে যুগে যেমন ছিল বিরল আজকের দিনেও তেমনি বিরল।

সেদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে মুজিবর রহমান ছিলেন সততা ও সঞ্জীবনের প্রতীক। তিনি মনে-প্রাণে আচার-ব্যবহারে ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ; তাঁর কাগজের নাম ছিল 'মুসলমান'। তবুও বিরোধী সাম্প্রদায়িকরা তাঁকে কোনদিন সাম্প্রদায়িক মনে করেননি। যুক্তিবাদী মুজিবর রহমানকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই সম্মান ও বিশ্বাসের চোখে দেখতো। উচ্চতর রাজকর্মচারীদেরও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তদানীন্তন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর স্যার আবদুর রহিম আলীপুর সেন্ট্রাল জেল পরিদর্শনে এসে এগিয়ে গিয়ে রাজবন্দী মুজিবর রহমানের কুশল জিজ্ঞাসা করতে ভুলেননি। উনিশ-কুড়ির শেষের দিকে নির্বাচন চালাবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যখন একটা এডপক সংস্থা গঠন করে তখন তাঁকে করা হয় তার সম্পাদক। সভাপতি আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাস। চিত্তরঞ্জনের কর্মক্ষেত্র ছিল ভারতব্যাপী। সবসময় কলকাতায় থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। অথচ নির্বাচন উপলক্ষে খরচ হতো হাজার হাজার টাকা।তাঁর যাতে অসুবিধা না হয় এজন্য তিনি অনেকগুলো ব্যাংক চেকসই করে তা মুজিবর রহমানের হাতে দিয়ে বললেন 'টাকার প্রয়োজনীয় অঙ্ক আপনি নিজেই বসিয়েনেবেন।' মুজিবর রহমান ইতঃস্তত করতে লাগলেন। পরে মনের কথা খুলে বললেন, এত টাকার ঝামেলায় আমি যেতে চাই না। কি কি বলে তার ঠিক কি। এ ভার আপনি অন্য কাউকে দিন।

চিত্তরঞ্জন নাকি তখন রেগে উঠে বলেছিলেন 'আমরা যদি মুজিবর রহমানের মতো লোকদের বিশ্বাস করতে না পারি তাহলে মনে করব আমরা এখনো স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়নি।' এ দায়িত্ব মুজিবর রহমানকে নিতেই হয়েছিল।' তাঁর মৃত্যুর পরের দিন অমৃতবাজার পত্রিকায় যে প্রয়ান-সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেখানে বলা হয়, 'He was

a man of great courage– sincerity and patriotism and as such he was high respects by all. Throughout his career he led a life of struggle. But never compromised his principles…. He was a man of most unassuming nature and always shunned publicity.'

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুজিবর রহমানকে তুলনা করেছেন তাঁর প্রিয় নবির সঙ্গে। 'দ্য মুসলমান'- এর বিংশতিতম বর্ষপুর্তি সংখায় রোকেয়ার যে শুভেচ্ছা বার্তাটি ছাপা হয় সেখানে তিনি লেখেন, ''দি মুসলমান'-এর জন্মের দিন থেকেই আমি অবিচ্ছিন্নভাবে এর একজন পাঠক এবং আমি লক্ষ্য করে আনন্দিত যে এটি আমাদের সম্প্রদায়ের সেবা করার জন্য গোড়া থেকে একই পথে সুসংহত ভাবে এগিয়ে চলছে, পক্ষপাতের বা ভ্রুকুটির ভয় না করে।

এটা সর্বজনমান্য সত্য যে কোনও জাতি তার সাহিত্য ছাড়া উঠে দাঁড়াতে হতে পারে না এবং সংবাদপত্র ছাড়া কোনও সাহিত্য উন্নতি করতে পারে না। মৌলবি মুজিবর রহমান সাহেব এই সত্যটি তাঁর হৃদয়ে অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি 'দ্য মুসলমান' শুরু করেছিলেন যখন বাংলায় মুসলমান সমাজের জন্যপত্রিকা খুব কমই ছিল এবং বাংলা তখন নিজেই ছিল 'বঙ্গভঙ্গ' নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির মধ্যে; আমাদের শ্রদ্ধেয় নবি (সা)-র মতো, যিনি আরবের অন্ধকার যুগে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন।'

১৯০৮ সালে দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর নিজের এলাকা বসিরহাট মহকুমার বেগমপুর, শিবচন্দ্রপুর, মাটিয়া, নেহালপুর, বিবিপুর, স্বরূপনগর, খাসপুর, বড় গোবড়ার মতো গ্রামগুলোতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করেন। সেই তালিকা সমেত একটি বিস্তারিত বিপোর্ট তিনি 'দ্য মুসলমান'-এ প্রকাশ করেন ১৯ জুন ১৯০৮-এ। সেখানে কড়া ভাষায় সরকারের সমালোচনা করে লেখেন কীভাবে সরকার এবং আমলাতন্ত্রের অপদার্থটায় গরিব মানুষ ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই সংবাদ থেকেই জানা যায়, বেঙ্গল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন চাঁদা তুলে যতটা সম্ভব সেবা করছে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের। পরের মাসে ৭ জুলাই সংখ্যায় জনৈক এ. বসুর সঙ্গে মুজিবর রহমানের এক যৌথ আবেদন থেকে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'ফেমিন ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। সেখানে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন করেন তাঁরা। জেলবন্দী অরবিন্দ ঘোষের মুক্তির জন্য আইনি লড়াই চালাতে প্রচুর অর্থের দরকার পড়ে। অরবিন্দর ঘোষের বোন সরোজিনী ঘোষ মুজিবর রহমানের কাছে আবেদন করেন, মামলার খরচ চালাতে যে অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করার জন্য তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি সাহায্যের আবেদন জানাতে চান। টানা এক মাস যেন সেই আবেদন 'দ্য মুসলমান'-এ ছাপা হয়। সরোজিনী ঘোষের সে আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯০৮ সালের ২৬ জুন থেকে 'For Aurobinda Ghosh' সেই আবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। মুজিবর রহমানতাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক ভাবনার সংস্পর্শে এসেছিলেন।

'দ্য মুসলমান' সম্পাদনা এবং প্রকাশ করার পাশাপাশি মুজিবর রহমান রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গড়ে তোলায় যেমন তাঁর ভূমিকা ছিল তেমনই আনজুমান-ই-উলামা-ই- বাংলার মতো সংগঠন গড়ে তোলার কাজেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। বেঙ্গল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনও তাঁর হাতে গড়া। এছাড়া নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতির তিনি ছিলেন সহ সভাপতি। ১৯২৬-২৭ সালে বাংলায় মুসলিম লিগকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যর্থ চেষ্টাও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ। তিনি বহুদিন বঙ্গীয় মুসলিম লিগের সেক্রেটারি পদে দায়িত্বে ছিলেন। ১৯২৬-এ তিনি অল ইন্ডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়োশনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। নারী শিক্ষার প্রসারে ১৯১১ সালে রোকেয়া যে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল তৈরি করেন, মুজিবর রহমান ছিলেন তার পরিচালন সমিতির সদস্য।

মুজিবর রহমান কখনও বাংলায় কিছু লিখেছিলেন কিনা তা জানতে পারিনি। কারণ তাঁর সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক 'খাদেম'-এর কোনও সংখ্যার হদিস পাওয়া যায়নি। আনিসুজ্জামান (মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র) বা মুস্তাফা নূরউল ইসলামও (সংবাদপত্রে জীবন ও জনমত) 'খাদেম' চোখে দেখেননি বা তার খোঁজ পাননি। মুজিবর রহমান ইংরেজিতে লিখতেই পছন্দ করতেন। জেলখানায় বসে যে ডায়েরি তিনি লিখেছিলেন সেটি ইংরেজিতে। পরে সেটি অনুবাদ হয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে মাসিক 'পূবালী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (সম্ভবত গত শতকের ষাটের দশক নাগাদ)। অনুবাদকের নাম বা প্রকাশকাল জানা যায় না। জেলখানা থেকে ভাইপো রফিকুর ইসলামকে যে চিঠি লিখেছেন তাও ইংরেজিতে।

মুজিবর রহমানের 'ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক' কিছু লেখা নিয়ে রফিকুর রহমান ছোট একটা সংকলন গ্রন্থ তৈরি করেন; 'INTERESTING SELECTIONS (from the writtings of Moulvi Mujibur Rahaman)– Editor of The Mussalman Compiled by R Rahman'। আমিনুর রহমান জানাচ্ছেন, 'মুজিবর রহমানের রসবোধ ও 'রেডি উইট' ছিল আসাধারণ। চট করে মুখের ওপর শ্লেষবাক্য দ্বারা কষাঘাত করতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। হাসি মুখেই তিনি ঝাল ঝাড়তেম। 'তাঁর ব্যঙ্গ রচনার বিষয়বস্তু সমাজের ছোটখাট বিসদৃশ ঘটনাবলী থেকেই সংগৃহীত হত, কোনটাই মনগড়া বা কাল্পনিক ছিল না।' মৌলবি মুজিবর রহমানের নামে কলকাতায় একটা রাস্তা আছে ১৯৮৪ সাল থেকে। রাস্তাটির নাম 'মৌলবি মুজিবর রহমান সরনি'। 'A History of Calcutta Streets' বইয়ে গ্রন্থকার কলকাতা গবেষক পি থাংকাপ্পান নায়ার লিখছেন, 'The Corporation has sanctioned the name of Maulavi Mujibar Rahaman Sarani to a Calcutta Impruvmant Trust Road under its Scheme No. VIII-A– on August 22,1984 রাস্তাটা কলকাতা পুরসভার ৬৭ নং ওয়ার্ডে। (শেষ)

মিথ্যা অভিযোগে ধৃত উমর খালিদের মুক্তির আহ্বান জানালেন ১৬০ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

শুভাশিস মজুমদার

ইতিহাসবিদ রাজমোহন গান্ধী, রোমিলা থাপার, রামচন্দ্র গুহ এবং ইরফান হাবিব সহ ১৬০ জন শিক্ষাবিদ উমর খালিদ সহ দিল্লি দাঙ্গা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগারে থাকা ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য নতুন করে আহ্বান জানিয়েছেন। ৩০ জানুয়ারী, খালিদের কারাবাসের ১,৬০০ দিন উপলক্ষে একটি বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন; 'তারা (পড়ুন বিজেপি) মহাত্মা গান্ধীর মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে, এবং ভারতের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যারা ক্ষমতায় আছে তারা যদি ভারতকে ভাগ করতে চায়, ভারতের জনগণ দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রস্তুত।' তাঁরা বলেন, 'উমর এবং তার মতো আরও অনেকে কঠোর বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে কারাগারে, জামিন ছাড়াই, বিচার ছাড়াই, বছরের পর বছর ধরে। তাঁরা কাউকে সহিংসতার জন্য অনুপ্রাণিত বা প্ররোচিত করেছিলেন বলে নয়, বরং তাঁরা শান্তি ও ন্যায়বিচারের রক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে অহিংস পথে বিরোধের পক্ষে ছিলেন বলে।'

শিক্ষাবিদরা যোগ করেছেন 'যেমন, উমর খালিদের সহকর্মী-ডিতেনু গুলফিশা ফাতিমার কবিতা পড়া আমাদের বেদনাদায়ক - কারণ তিনি কারাগারের 'নিরব দেয়াল' সম্পর্কে লিখেছেন। একজন উজ্জ্বল তরুণ ছাত্র কর্মী, একজন এমবিএ স্নাতক এবং একজন ইতিহাস প্রেমী, গুলফিশা তার পঞ্চম বছর কারাগারে কাটাচ্ছেন।' একইভাবে, আশ্চর্য হতে হয় যে খালিদ , সাইফিকে কেবল ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করার জন্য 'শাস্তি' দেওয়া হচ্ছে যা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমতার কথা বলে। শারজিল ইমাম, ইতিহাসের একজন উজ্জ্বল জ্ঞানী এবং ছাত্র কর্মী, প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত করেছেন যে তিনি যখন জানতেন যে এই শাসনের অধীনে ভিন্নমত পোষণকারীদের গ্রেপ্তারের ঝুঁকি আছে, কিন্তু তখন তিনি 'সন্ত্রাসবাদের' অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন বলে আশা করেননি, বিশেষ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করার ১ মাস পরে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার জন্য।'

অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন ঔপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষ, অভিনেতা রত্না পাঠক এবং নাসিরুদ্দিন শাহ, এবং শিক্ষাবিদ গায়ত্রী স্পিভাক এবং আকিল বিলগ্রামী। বিবৃতিতে উপসংহারে বলা হয়েছে 'আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীরা, কীভাবে উমরের মতো একজন উজ্জ্বল এবং সহানুভূতিশীল যুবক, যিনি একজন ইতিহাসবিদ হিসাবে প্রশিক্ষিত এবং একজন সমালোচনামূলক চিন্তাবিদ হিসাবে লালিত-পালিত হয়েছেন, তাঁকে একটি কর্তৃত্ববাদী শাসনের দ্বারা বারবার লক্ষ্যবস্তু, নিন্দিত এবং ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে তা দেখে গভীরভাবে বিচলিত হয়েছি। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি উমর এবং এই (সম- অধিকার নাগরিকত্ব) সামাজিক কর্মীদের মুক্ত হতে দেখব যাতে তাঁরা একটি সমান (অধিকার যুক্ত) এবং ন্যায্য ভবিষ্যতের জন্য অবদান রাখতে পারেন।' এই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ১৮ জনের মধ্যে সাতজন জামিন পেয়েছেন, যার মধ্যে দুজন দিল্লি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্যারোল পেয়েছেন। এর আগে,চার বছর ধরে ইউএপিএ আইনে কার্যত বিনা বিচারে বন্দি ইতিহাসের মেধাবী গবেষক উমর খালিদকে নিয়ে তথ্যচিত্র 'কয়েদি নম্বর ৬২৬৭১০' তৈরি হয়েছে।

২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার সাথে সম্পর্কিত একটি ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের অপেক্ষায় থাকা মানব অধিকার কর্মী উমর খালিদের কারাগারে চতুর্থ বছর চিহ্নিত করতে ১৩ সেপ্টেম্বর,শুক্রবার, বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় (প্রতিবাদী) মন্তব্য ও পোস্ট করেন। অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর এক্স-এ পোস্ট করেছেন 'আজ জামিন, বিচার বা অপরাধ ছাড়াই উমরখালিদের কারাবাসের ৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক বলে মনে করা দেশে এটি একটি প্রতারণা। এটা আমাদের বিচার ব্যবস্থার জন্য লজ্জাজনক এবং বিব্রতকর দলিল। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বরা আরো বলেন যে উমর খালিদ, শারজিল ইমামদের জেলবন্দি করা তাঁদের ধর্মের (মুসলিম) কারণে সুবিধা হয়েছে। এমনকি, শুধুমাত্র জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়নি বলে দাবি করেছেন স্বরা।

আরও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন জেএনইউ গবেষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফটো এবং পোস্টার সহ একই রকম বার্তা পোস্ট করেছেন। অ্যাকাডেমিক এবং অ্যাক্টিভিস্ট যোগেন্দ্র যাদব এক্স-এ একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করেছেন 'এই চার বছর আমাদের বিচার ব্যবস্থায় এবং ভারতের সংবিধানে একটি কালো দাগ।' যুব হাল্লা বোল আন্দোলনের অনুপম এক্স-এ খালিদের কাছ থেকে ২০২২ সালে পাওয়া একটি চিঠি পোস্ট করেছেন। অনুপম বলেন 'আমার বন্ধু খালিদ জেলে চার বছর পূর্ণ করেছে। অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনের সময় আমাকে যখন তিহার জেলে পাঠানো হয়, তখন তিনি এই সুন্দর চিঠিটি লিখেছিলেন। আমি এখন জেলের বাইরে আছি, কিন্তু সে কোনো অপরাধের বিচার বা জামিন ছাড়াই অন্যায় (নির্যাতন) ভোগ করছে।' উমরকে নিয়ে ছবিটিতে মহারাষ্ট্রের সেই তথাকথিত বিতর্কিত বক্তৃতাটি দেখানো হয়েছে। তাতে উমর গান্ধির পথে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথাই বলছেন।

ছবিতে উমরের সহযোদ্ধারা বলেছেন, জেলে ইতিমধ্যে গোগ্রাসে ২০০টির বেশি বই পড়ে ফেলেছেন উমর। কবে ছাড়া পাবেন তাঁরা উত্তর নেই। তবু এই কঠিন সময়েও সুরসিক উমরের সঙ্গে জেলে সাপ্তাহিক মোলাকাতে উজ্জীবিত বোধ করেন সহযোদ্ধারা। শুধু উমরের জন্য নয়, দেশে গণতন্ত্র বাঁচাতেই উপনিবেশ যুগের ইউএপিএ-র বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার তাগিদ মনে করান তাঁরা। উমরের অন্য সহযোদ্ধা শরজিল ইমাম, গুলফিসা ফাতিমা, মিরান হায়দর, শিফা-উর-রহমান, খালিদ সৈফি, মহম্মদ সালিম খানদের 'কালা কানুনে' (ইউএপিএ) বন্দি থাকার কথা নিয়েও আলোচনা

হয়েছে। উমরকে নিয়ে ললিত ভাচানির তৈরি ছবিটিও মনে করাচ্ছে, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে খেসারত দেওয়া এই নামগুলি সকলেই মুসলিম। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আট বছরে আগে জেএনইউ-এর ছাত্র উমর সরস ভঙ্গিতে পথসভায় বলছেন, ''আমার নাম উমর খালিদ, কিন্তু আমি জঙ্গি নই। আমি তো নিজের মুসলিমত্ব নিয়ে আলাদা করে ভাবতামই না। কিন্তু মুসলিম পরিচয়টাই আমার গায়ে সেঁটে দেওয়া হল।'' ২০১৯-এর নাগরিকত্ব আন্দোলনের বিভিন্ন 'মুখ'কে দেশদ্রোহী প্রতিপন্ন করা হলেও ছবিতে ২০১৯-২০র বক্তৃতা সভায় উমর বলছেন, ''আমি গর্বিত ভারতীয় মুসলিম। ঘটনাচক্রে নয়, স্বেচ্ছায়। জিন্না নয়, আমার নেতার নাম গান্ধি, আজাদ, অম্বেডকর।'' ❐

গুজরাট দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুখ জাকিয়া জাফরি প্রয়াত

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

মানবতাবাদী কর্মী জাকিয়া জাফরি গত ৩১ জানুয়ারি বেলা ১১টায় আহমেদাবাদে তাঁর মেয়ের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর ৮৬ বছর বয়স হয়েছিল। ২০০২ সালের গুজরাটে ভয়াবহ দাঙ্গার সময় শ্রীমতী জাফরির স্বামী প্রাক্তন এম.পি কংগ্রেস নেতা কবি এহসান জাফরি নিহত হন। ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এক উন্মত্ত জনতা আহমেদাবাদের গুলবর্গা হাউজিং সোসাইটি আক্রমণ করে। এহসান জাফরি ও আরো ৬৯ জনকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। গত দুই দশক ধরে জাকিয়া জাফরি ন্যায় বিচার চেয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

গুজরাট দাঙ্গা বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতি এ এস খান উইলকর , দিনেশ মাহেশ্বরী এবং সি টি রবিকুমারকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ গত ২০২২ সালের ২৪ জুন আহমেদাবাদের গুলবর্গা সোসাইটি হত্যা মামলা সম্পর্কে রায় দেন। ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে এক বিশাল দাঙ্গাবাজ জনতা ওই হাউসিং সোসাইটি আক্রমণ করে। ওখানে বাস করতেন কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন এম.পি এহসান জাফরি। ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে তিনি প্রশাসনের সমস্ত স্তরে বারবার আকুল আবেদন করেও কোনও পুলিশ প্রটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। অবশেষে ওই দাঙ্গাবাজ জনতার হাতে ওই হাউসিং সোসাইটিতে ৬৯ জন নিহত হন। এহসান জাফরির হাত পা কেটে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। হাউসিং সোসাইটিটি অগ্নিদগ্ধ হয়ে আজও পরে আছে।উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে দিয়ে ওই নিম্ন মধ্যবিত্ত মালিকদের ওখানে ফিরে যাবার রাস্তা বন্ধ। নিহত এহসান জাফরির স্ত্রী জাকিয়া জাফরি বিচার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। সেই মামলাই সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছয়। সুপ্রিম কোর্ট ২০০৮ সালে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিম (সিট) গঠন করে দেয়। ওই সিট , নরেন্দ্র মোদি ও গুজরাত প্রশাসনকে নির্দোষ ঘোষণা করলে তার বিরুদ্ধেও জাকিয়া জাফরি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। তাঁকে সহায়তা করেন তিস্তা শেতলবাদ ও তাঁর সংগঠন সিটিজেন ফর জাস্টিস এন্ড পিস (সিজেপি)।

সুপ্রিম কোর্টের উপরোক্ত বেঞ্চ ওই আবেদন ভিত্তিহীন বলে নাকচ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে আদালত তিস্তার ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছে এই আইনি লড়াইয়ে জাকিয়া জাফরিকে সহায়তা করার জন্য। তারা বলেছেন 'জাকিয়া পরিস্থিতির শিকার । আর এই আবেগকে কাজে লাগিয়েছেন তিস্তা '। জাকিয়া জাফরির আবেগকে কাজে লাগিয়ে তিস্তার কী লাভ সে সম্পর্কে অবশ্য এই বেঞ্চ কোনও ব্যাখ্যা দেননি। তাঁদের মতে এই মামলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একই সঙ্গে বিচারপতিরা গুজরাত পুলিশের দুজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার আর.বি.শ্রীকুমার ও সঞ্জীব ভাটের ভূমিকারও কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন , তারা অকারণে গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে গিয়েছেন।

এই তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছেন তদন্তকারী ' সিট ' কী অসম্ভব ভালো তদন্ত করেছে ।শুধুমাত্র বোঝা গেল না ওই হাউসিং সোসাইটিতে সারা দিন ধরে পুলিশের নাকের ডগায় আক্রমণ চালিয়ে এহসান জাফরিসহ ৬৯ জনকে হত্যা করলো মাত্র ২১ জন লোক। তাও ১০ জনের অপরাধ লঘু।বাকি ১১জনের কারো Sentence হয় নি। কিছু দিনের কারাবাস হয় , আবার জামিনও হয়েছে। ২০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে । কিন্তু তাতে কী হয়েছে ? এই তিন সদস্যের বেঞ্চ এই রায়ে আর যা বলেছে তা অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব। মহামান্য বিচারপতিরা বলেছেন, যারা এই আবেদনে জাকিয়া জাফরির পাশে দাঁড়িয়েছেন , তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে শাস্তি দেওয়া উচিত।

ওদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ওই বেরোনোর পরদিনই সকালে সংবাদ সংস্থা ANI দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন মোদীজি নীলকণ্ঠ । তিনি এই সমস্ত সাংবাদিক ও সমাজসেবা মূলক সংস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে বলেন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ। তিনি একথাও বলেন যে যদিও তিনি এখনও সম্পূর্ণ রায় পড়েন নি ,তবে ওই রায়ে তিস্তা শিতলবাদের নাম আছে। আপ ক্রনোলজি সমঝিয়ে। গুজরাট পুলিশ আর দেরী করেনি ।শীর্ষ আদালতের রায়কে হাতিয়ার করেই ২৫ জুন আমেদাবাদের একটি থানায় ৮ পাতার এফ.এই.আর দায়ের করা হয়। এরপরই গুজরাট পুলিশের এন্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড (ATS) মুম্বাই থেকে তিস্তা শেতলবাদকে গ্রেপ্তার করে। গুজরাট পুলিশের প্রাক্তন আই.জি , আর.বি. শ্রীকুমারকে গ্রেপ্তার করা হয় আমেদাবাদ থেকে। সঞ্জীব ভাট আগেই একটি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে আছেন।

২৬ জুন অনেকগুলি ষড়যন্ত্রমূলক ধারায় অভিযোগ দায়ের করে তিস্তা শেতলবাদকে আমেদাবাদের মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করলে তাঁকে ১ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে দেওয়া হয়। অবশ্য বর্তমানে তিস্তা শেতলবাদ জামিনে আছেন।

সিট (SIT) এর তদন্ত বিষয়ে কয়েকটি কথা

২০০২ সালে গুজরাতের ভয়াবহ দাঙ্গা , যার মধ্যে গুলবার্গ সোসাইটির হত্যাকান্ড আছে , সম্পর্কে তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্ট ২০০৮ সালে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিম (SIT) গঠন করে। তাহলে এই কথাটা স্পষ্ট যে ওই দাঙ্গা ও হত্যাকান্ড সম্পর্কে গুজরাত পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে আস্থা রাখতে না পারার ফলেই সুপ্রিম কোর্ট ২০০৮ সালে SIT গঠন করে দিয়েছিল। SIT এর যিনি প্রথম মুখ্য অধিকর্তা ছিলেন সেই আর কে রাঘবন ২০১৪ সালের জুলাই মাসেই জানান গুজরাত দাঙ্গায় ওই রাজ্য সরকারের কোনও গাফিলতি ছিলনা।মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এই দাঙ্গার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি। দুই আই.পি.এস অফিসার সঞ্জীব ভাট ও আর.বি. শ্রীকুমার সম্পর্কে SIT এর বক্তব্য , ওরা অসত্য কথা বলেছিলেন। এই দুই আই.পি.এস অফিসার তাঁদের সাক্ষ্য তে বলেন, মোদি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মিটিংয়ে সিনিয়র পুলিশ অফিসারদের বলেছিলেন কিছুদিন চুপ থেকে হিন্দুদের ক্রোধ প্রকাশ করার সুযোগ দিন। SIT-এর বক্তব্য এই দুই পুলিশ অফিসার মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

আরকে রাঘবনকে এরপরই নরেন্দ্র মোদির সরকার সাইপ্রাসে রাষ্ট্রদূত করে পাঠায়। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের মুখ্য বিচারপতি শ্রীখানউইলকর কে ভারত সরকার দেশের লোকপাল পদে নিয়োগ করেছেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ।

এই সব বিষয় SIT দেখেছে কি ?

সম্মানিত বিচারপতি ওয়াই.ভি.কৃষ্ণ আয়ার-এর নেতৃত্বে যে নাগরিক কমিশন গঠিত হয়েছিল, তাঁরা অসংখ্য মানুষের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করে, বহু নমুনা সংগ্রহ করে, প্রশাসনের বক্তব্য গ্রহণ করে। ওই কমিশনের রিপোর্ট SIT ও সুপ্রিম কোর্ট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলে আইনজীবী প্রশান্তভূষণ ও সমাজকর্মী মালা হাশমি সংবাদ মাধ্যম The Wire এর সাংবাদিক আসমা খানম শেরওয়াণীকে জানান। তাঁরা বলেন SIT এর তদন্তকারীরা ওই ২৮ ফেব্রুয়ারি , ২০০২ এর অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের Call List কেন চেক করেনি ? কেন নারোদা পাতিয়া ও গুলবার্গ সোসাইটির হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড বাবু বজরঙ্গি এখনো জামিন পেয়ে বাইরে। ২০ বছর তো হয়ে গেলো।

বেস্ট বেকারি হত্যাকান্ড, যাতে ১৬ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল, সেই হত্যার জন্য কেন একজনেরও শাস্তি হলো না ?

রানা আয়ুবের লেখা ‘গুজরাট ফাইল’, মনোজ মিত্তা ‘র ‘Friction of fact findings' , আশিস খৈতানের ‘ স্ট্রিং ভিডিও ‘ প্রভৃতি তদন্তমূলক বিশদ প্রতিবেদনগুলি SIT আদৌ দেখেনি। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বেঞ্চও ওগুলির ভিত্তিতে নতুন করে তদন্তের কথা না বলে SIT , গুজরাত সরকার ও নরেন্দ্র মোদিকে ‘ ক্লিন চিট ‘ দিয়েছে। ওগুলি পরীক্ষা করলেই বোঝা যেত গুজরাত দাঙ্গার মাস্টার মাইন্ড কে বা কারা ?

সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান রায়

সুপ্রিম কোর্টের মতে SIT খুব ভালো তদন্ত করছে ও গুজরাত সরকারেরও কোনো দায়িত্ব নেই এই দাঙ্গার জন্য , সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিতেই পারে। কিন্তু যাঁরা তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির জন্য জন্য আবেদন করেছিলেন তাঁদের কিছু Disgruntled Element (হতাশ ব্যক্তি) ও তাঁরা Ulterior Motive (সুদূর প্রসারি উদ্দেশ্য) নিয়ে এই কাজ করেছে বলে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত দুই বিচারপতি , যাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত। এঁরা হলেন জাস্টিস মদন বি লকুর এবং দীপক গুপ্তা। আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে এইভাবে কারো সম্পর্কে মন্তব্য করা Principle of Natural Law Of Justice বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট SIT কে নিয়োগ করেছে বলে তার তদন্ত নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবেনা এই ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করেন।

আইনজীবী প্রশান্তভূষণ মনে করিয়ে দিয়েছেন ওই ভয়ঙ্কর দাঙ্গার পর গুজরাত সরকারের আচরণ সম্পর্কে ২০০৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন দুই বিচারপতি জাস্টিস দোরাইস্বামী রাজু ও জাস্টিস অরিজিৎ পাসয়াত বলেছিলেন ‘ এরা হচ্ছে আধুনিক যুগের নিরো। তাঁরা বলেছিলেন ক্ষ্মযখন নারী ও শিশুরা জ্বলছে , নির্বিচারে নিহত হচ্ছে তখন গুজরাট প্রশাসন হত্যাকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছে।” সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বেঞ্চ তৎকালীন ডিভিশন বেঞ্চের ওই বক্তব্য সম্পর্কে কী বলবেন ?

প্রবীণ আইনজীবী কামিনী কৌশল জাকিয়া জাফরির প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন , ‘ এটি খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে শ্রীমতী জাফরির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। সকলেই জানেন যে বছরের পর বছর এই বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি ও তাঁর পরিবার এই ভয়ঙ্কর ফৌজদারী অপরাধের শিকার হয়েছেন। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে তিনি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন।’ শ্রীমতি কৌশল বলেন, শ্রীমতী জাফরি যে সাহসের সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন , তার জন্য তাঁকে সালাম জানাই।’

জাফরি পরিবারের ও মানবাধিকার রক্ষার অপর আইনজীবী অপর্ণা ভাট বলেন , ‘ শ্রীমতী জাফরি এক নৃশংস দাঙ্গাকারীদের হাতে তাঁর স্বামীকে শুধুমাত্র ধর্মের কারণে খুন হতে দেখেছেন। তিনি সব কিছু হারালেও নিজের সাহস ও ধৈর্য কখনও হারাননি। আমি গর্বিত আমি তাঁদের পরিবারের আইনজীবী ছিলাম ও এই মহীয়সী নারীর সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে ছিলাম।‘ ❐

বর্তমান বৈশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প এবং মোদীর বৈঠক

সৌর বসু

এভারেস্ট বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নেপাল গিয়েছিলাম। সে আজ থেকে প্রায় কুড়ি বাইশ বছর আগেকার কথা। সেই সময় 'হোটেল ইন রুয়ান্ডা' বলে একটি ভিডিও ক্যাসেট কিনেছিলাম কাঠমান্ডুতে । তখন আমাদের শান্তিনিকেতনে একটি ফিল্ম সোসাইটি ছিল ,সেখানে প্রদর্শনের জন্য। হোটেল রুয়ান্ডা ছবিটি ছিল টুটসি এবং হুডু গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের উপর।

হোটেল রুয়ান্ডা ছবিটিতে বাস্তব ঘটনার সত্যতার উপর ভিত্তি করে হুডু এবং টুটসি দুটো উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষের চরমতম রূপ প্রদর্শিত হয়েছে। এরপর বহু বছর কেটে গেছে। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের বিভীষিকা এখনও বর্তমান।। আজো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গৃহযুদ্ধ, দুটো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। অগুনতি মানুষের জীবনহানী হচ্ছে। ইউরোপে- রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে বা পশ্চিম এশিয়ায় ইসরাইলের সঙ্গে ফিলিস্তিনি ও ইরান লেবানন প্রভৃতি রাষ্ট্রের মধ্যে হিংসাত্মক সংঘাত, এশিয়ার মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ, এই বাংলাদেশের গৃহযুদ্ধ, পাকিস্তান এবং ইরানের বিরুদ্ধে বালুচিস্তানের মানুষের বিদ্রোহ, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি বেকারি এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির জামানায় পুঁজিবাদীদের লক্ষ্য শুধু বাজার দখল করা, মুনাফা বৃদ্ধি করা। বাজার দখল করা নিয়ে চীন আমেরিকার মধ্যে ছায়া যুদ্ধ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চীন রাশিয়ার ছায়া যুদ্ধর ফলে পৃথিবীজুড়ে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। তার নির্দেশ কেউ মানছে না। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের রায়কে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ শান্তিকামী ,কিন্তু তাদের কথা কে ভাবে। বিশ্ব জোড়া এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকাতে নির্বাচন সম্পন্ন হল। ক্ষমতায় এলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যার পরিচয় ক্ষমতালোভী অহংকারী অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, উগ্র জাতীয়তাবাদী , অস্থিরমতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হিসাবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে হুমকি দিয়েছেন গ্রীনল্যান্ড দখল করে নেবেন, পানামা খালের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করবেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র কানাডাকেও তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা এখন অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। বেকারি এবং মূল্যবৃদ্ধি আমেরিকাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতায় এসে বলেছেন মুল লক্ষ্য 'Make America Great Again'। তার এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তিনি সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করতে প্রস্তুত। শুল্কের প্রাচীর তুলে তিনি আমেরিকার অর্থনীতির হাল ফেরাতে আগ্রহী।অন্যদিকে তিনি শান্তির দূত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন।রাশিয়া- ইউক্রেনের এর যুদ্ধের চাবিকাঠি যেন তার হাতে। পশ্চিম এশিয়ায় ইসরাইল এবং গাজা ভূখণ্ডের ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি স্থাপনে তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা হুমকির সামিল।

গাজা ভূখণ্ডের ফিলিস্তিনিদের তিনি অন্যত্র সরিয়ে দেবেন। ফিলিস্তিনিয়রা সরে গেলে তিনি ঘোষণা করেছেন গাজা ভূখণ্ডে আমেরিকা তার মালিকানা কায়েম করবে। এ এক বিস্ময়কর ঘোষণা। বস্তুত তিনি একটি ভূখণ্ডের অধিবাসীদের নির্মূল করে একটি নগরী পুনর্নির্মাণের কথা বলেছেন। তার এই ঘোষণা আত্মম্ভরিতার বহিঃপ্রকাশ, আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। শান্তি স্থাপনের পরিবর্তে তার এই সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি শান্তি বিঘ্নের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় রাষ্ট্রপতি আসনে বসার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সঙ্গে দেখা করতে আমেরিকা গেছেন। নরেন্দ্র মোদী চতুর্থ রাষ্ট্র নেতা হিসাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেলেন। নরেন্দ্র মোদীর তাবেদার সংবাদ মাধ্যম বিষয়টি নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর ঢাক পিটিয়ে চলেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকারের কয়েক ঘন্টা পূর্বে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের শুল্কনীতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর কড়া সমালোচনা করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ভারত বর্ষ খুব উচ্চহারে আমেরিকার পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করার ফলে আমেরিকার রপ্তানি মার খাচ্ছে। ভারতকে তিনি শুল্কের রাজা আখ্যা দেন। যদিও ভারত সরকার আমেরিকাকে তুষ্ট করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মোটরসাইকেল সহ অন্যান্য পণ্যের উপর থেকে শুল্ক হ্রস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি, নরেন্দ্র মোদীর শুল্ক নীতির সমালোচনা করলেও, সাংবাদিক সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদী বলেন তিনি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী । ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' এর মতোই তিনি ' মেক ইন্ডিয়া গ্রেট এগেইন' স্লোগানে বিশ্বাস করেন। এর অর্থ ভারতের স্বার্থকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দেওয়া। এই স্লোগান উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিচয় বহন করছে। এখানেই উগ্র জাতীয়তাবাদী ক্ষমতা লিপ্সু ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চরিত্রগত সাদৃশ্য।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠক সম্বন্ধে বিশ্বের গণমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে নরেন্দ্র মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। রয়টার্স জানাচ্ছে যে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাবে। The

Financial times জানাচ্ছে যে আগামী ১০ বছরের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় ভারতকে এফ-৩৫ যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করা হবে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে চীনের প্রভাব মোকাবিলার সঙ্গে বিষয়টি যুক্ত বলে রয়টার্স জানিয়েছে। কিন্তু এর ফলে চীনের ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা এবং চীনের সঙ্গে ভারত কিভাবে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে সেটা এখন লক্ষণীয়।

এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা বাইরে থেকে গেছে। তার মধ্যে ইরানের চাবাহার বন্দরটি অন্যতম। এই বন্দরটির উন্নতি কল্পে ইরানের সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে ইরানের শত্রুতা সর্বজন বিদিত। তার প্রতিফলন ভারতের তেল আমদানির ক্ষেত্রে পড়তে পারে। ইরানের উপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ভারত, রাশিয়া থেকে চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে ইতিপূর্বে তেল আমদানি করেছে। আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের উপর ভারতের তেল আমদানির বিষয়টি অনেকখানি নির্ভরশীল ।

আমেরিকার শুল্কনীতি, উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর বিশেষ আঘাত হানতে পারে বলে মনে করছে সিএনএন। কারণ আমেরিকা থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি যে শুল্ক আরোপ করে তার মূল্য, ভারতের মতো উন্নয়নশীন দেশ গুলি থেকে আমেরিকার আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কের তুলনায় অনেক বেশি।। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী আমেরিকা থেকে ভারতের পণ্য আমদানির গড় শুল্কহার ছিল ৯.৫। সেখানে সেখানে ভারত থেকে পণ্য আমদানির উপর আমেরিকার শুল্ক হারের গড় ছিল ৩ শতাংশ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক হ্রাস পেতে পারে।

নরেন্দ্র মোদির ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য বিষয়, আমেরিকা থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মন্তব্য নরেন্দ্র মোদী করেননি। এই বৈঠকের কিছুদিন আগে ১০৪ জন ভারতীয় অভিবাসীকে হাতে পা শিকল দিয়ে বেঁধে, আমেরিকার সামরিক বিমানে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ভারতবর্ষের নাগরিকদের সঙ্গে মার্কিন সরকারের এই অমানবিক আচরণের সংসদে প্রতিবাদ করেছে বিরোধীপক্ষ। নরেন্দ্র মোদি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের সময় এ বিষয়ে একটি কথাও বলেননি, উপরন্তু ঘটনাটা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। কলম্বিয়ার অভিবাসীদের যখন এইভাবে আমেরিকা থেকে সাময়িক বিমানে ফেরত পাঠানো হয় তখন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং কলম্বিয়ায় বিমান অবতরণে বাধা দেয়। আমেরিকায় বিমান ফেরত যাবার পর কলম্বিয়া সরকার তার নিজস্ব বিমানে অভিবাসীদের নিজের দেশে ফিরিয়ে আনে। কলম্বিয়ার মত একটি ক্ষুদ্র দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাহস পেল ,অথচ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অমানবিক সিদ্ধান্তকে নতমস্তকে গ্রহণ করে ভারতের নাগরিকদের মুখে চুনকালি লাগালেন। এবারের নরেন্দ্র মোদী -ডোনাল্ড ট্রাম্প বৈঠক, নরেন্দ্র মোদীর চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ সর্বসাধারণের সামনে উন্মোচিত করে দিল। ❐

মণিপুর খালি হাতে ফিরলেন পাত্র। এখনও সম্বিত ফেরেনি বিজেপির।

মনিরুল হক

মণিপুরের প্রাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিরেন সিং এর মদতে ২০২৩ সালের প্রথম দিক থেকেই রাজ্যে অশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করে। রাজ্যের দুটি প্রধান জনগোষ্ঠি হল মেইতে এবং কুকি। কুকিরা ছিল সংরক্ষণের আওতায়। আগে মেইতেরা সংরক্ষণের আওতায় থাকাটা সম্মানজনক মনে করত না। কিন্তু RSS-BJP র প্ররোচনায় তারা সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন শুরু করে এবং মণিপুর হাইকোর্ট তাদের পক্ষ নেয়। এই অবস্থায় কুকি ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়, মিছিল আক্রান্ত হয় এবং গোটা রাজ্য অশান্ত হয়ে ওঠে। খুন, রাহাজানি, অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, ধর্ষন- সব মিলে গোটা মণিপুর নৈরাজ্যের অন্ধকারে ডুবে যায়। অন্তত ২৬০ জন মানুষ নিহত হয়, ৬০০০০ মানুষ গৃহহারা, যারা প্রায় সবাই শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা।

সঙ্গত কারণেই বিরোধী রাজনীতিকরা, বিভিন্ন মানবাধিকার ও সামাজিক সংগঠন, সংবেদনশীল ব্যক্তিবর্গ এই অরাজকতার জন্য বিজেপি দল, সরকার এবং তাদের প্রধান মুখ মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেন এবং সত্বর তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। মাঝখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে একবার পদত্যাগের নাটক করলেও সংশ্লিষ্ট কেউই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ বা রাষ্ট্রপতি শাসনের ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। ঘটনার ২১ মাস পরে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং দিল্লীর কর্তাদের সঙ্গে প্রেমালাপ সেরে ইম্ফল ফিরে হঠাৎই ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে পদত্যাগ করে বসলেন। এদিকে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা ছিল ১০ ফেব্রুয়ারি। সংবিধানের ১৭৪ (১) ধারা অনুযায়ী দুটি বিধানসভা অধিবেশনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৬ মাসের বেশি হতে পারে না। আগের অধিবেশন বসেছিল ১২ আগস্ট অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন শুরু করতেই হত। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং ডেট লাইন ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে যেহেতু বিধানসভার অধিবেশন বসেনি সেক্ষেত্রে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু কেন এই আচমকা পদত্যাগ এবং পট পরিবর্তন? প্রধান কারণ হল কংগ্রেস দলের লাগাতর সক্রিয়তা। মণিপুর কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধী গোলমালের সেই প্রথম দিন থেকে নিরলসভাবে আর্ত মণিপুরবাসীর পাশে থেকেছে, তাঁদের সাহস যুগিয়েছে এবং বিজেপির অপকর্মের বিষয়ে দেশবাসীকে সজাগ করেছে। এবারও বিধানসভার অধিবেশন বসার

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস দল বীরেন সিং-এর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে বিধানসভার স্পীকারের কাছে সরকারীভাবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছে। এই অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি হলে বীরেন সিং এর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ ৫ জন কংগ্রেস এম এল এ ছাড়াও ১০ জন কুকি এম এল এ প্রথম থেকেই বীরেনবাবুর বিরুদ্ধে ছিলেন। আর বিজেপির মেইতে এম এল এ দের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি হয়ে উঠেছেন কট্টর বীরেন বিরোধী। এক কথায় বিধানসভা অধিবেশন বসার আগেই বীরেনবাবু গো-হারা হেরে বসে ছিলেন। বিধানসভার মধ্যে হারাটা আরও বেশি বেইজ্জতি হত তাই বীরেনবাবু অমিত শাহ'র পরামর্শে আগেভাগেই পদত্যাগ করে বসলেন।

অমিত শাহ'র দূত হয়ে সম্বিত পাত্র এরপর ইম্ফল গেলেন এবং চেষ্টা করলেন বীরেন সিং কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সর্বসম্মতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসান যায় কি না। কিন্তু ম্যারাথন বৈঠকেও সর্বসম্মতভাবে কাউকে মনোনীত করতে পারলেন না। অগত্য হাল ছাড়ল বিজেপি এবং অবধারিতভাবে জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। শোনা যাচ্ছে, রাজ্যপাল অজয় ভাল্লা, মুখ্যসচিব পি কে সিংহ, ডি জি পিরাজীব সিংহ এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুদীপ সিংহ, এঁরা সবাই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পক্ষেই ছিলেন। কুকিরা কিছুতেই মেইতেদের কতৃত্ব মানতে চাইছে না তারা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। আর কংগ্রেস দল তো প্রথম থেকেই রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে ছিল। তবু মণিপুর কংগ্রেসের নেতারা মনে করছেন, বীরেন সিং বিধানসভায় পরাজিত হলে আরও ভালো হত এবং তখন বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকত। তবে সেক্ষেত্রে সেই সরকারও হত খুব দুর্বল। এদিকে মেইতেদের সামাজিক সংগঠন গুলির যৌথ মঞ্চ কোকোমি রাষ্ট্রপতি শাসনের বিরোধিতা করেছে কারণ তারা চেয়েছিল আর যাই হোক রাজ্য শাসনের ভার যেন মেইতেদের হাতে থাকে। এক্ষেত্রে সেটা হল না। কিন্তু এতসব করেও মণিপুর সমস্যা সমাধানের কোন আলোকরেখা এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সরকার এর আগেও বারবার বলেছে শরণার্থী শিবির খালি করে বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু মানুষ কোথায় যাবেন? কোথায় তার বাড়ি, কোথায় তার ঘর? কোথায় তার গ্রাম? সে সব তো নেই, তার উপর আছে নিরাপত্তাহীনতা। ফলে প্রায় কেউই ফিরতে পারেনি নিজের পরিচিত জায়গায়। আর সংঘর্ষ তো এখনও চলছে। গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠীতে-সামরিক বাহিনীতে প্রত্যক্ষ এবং চোরাগোপ্তা আক্রমণ এখনও চলছে। চাষবাস কোথায়? জীবিকার কি হবে? স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল? দু'বছর হতে চলল নিজভূমে পরবাসী হয়ে কাটাচ্ছেন মণিপুরবাসী।

শুধু মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন বা সরকার পরিরর্তন নয়, নয় রাষ্ট্রপতির বকলমে সেনাবাহিনীর শাসনের ব্যবস্থা; মণিপুরের হাল ফেরাতে সর্বপ্রথম যা দরকার তা হল সরকারের সদিচ্ছা। না, সরকারের কোন সদিচ্ছা নেই। সদিচ্ছা থাকলে সমস্যা সমাধানের কোন দরকারই হত না কারণ সমস্যাই তৈরি হত না। একথা বলছি এইজন্য যে এবারের সমস্যা একশ শতাংশ সরকারের তৈরি!

আর একটা কথা। রাজ্যে সুশাসন কায়েম করার ক্ষেত্রে মণিপুর তেমন গুরুত্ব না পেলেও কোন এক মন্ত্রবলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির ক্ষেত্রে সে সবচেয়ে এগিয়ে। এই নিয়ে ১১ বার মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হল যা অন্য সব রাজ্যের রেকর্ড কে ছাড়িয়ে গেছে। নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে - কেন্দ্রীয় সরকার কি মণিপুর ও বাকি FAR EAST-এর রাজ্যগুলি সহ সব অঙ্গরাজ্যকে সমান চোখে দেখে? কেন্দ্রীয় সরকার গো-বলয়ের রাজ্যগুলিকে যে গুরুত্ব দেয় গো-বলয়ের বাইরের রাজ্যগুলিকে কি সেই গুরুত্ব দেয়? ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী এই রাজ্যগুলির মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ক্ষোভ-হতাশা কি সত্যিই প্রভাবিত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে?

যদি সত্যিই মণিপুরের জনগণের গুরুত্ব দিল্লীর কাছে থাকত তাহলে কি এই প্রায় দু'বছর ধরে মানুষের ভোগান্তি একই রকম থাকত? কেন্দ্র যদি মণিপুরের মত দূরবর্তী ও ছোট রাজ্যগুলির বিধানসভাগুলিকে গুরুত্ব দিত তাহলে কি এতো ঘন ঘন সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হত?

নিজেই নিজেকে বললাম,
এই সবকটি প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটিই - তা হল
'না।' ❐